মুখোশ ও মুখশ্রী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক
প্রকাশিত ও গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পূজনীয় মাতুল

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে—

এই লেখকের—

পথের পাঁচালী
অপরাজিত
আরণ্যক
অনুবর্তন
অভিযাত্রিক
অসাধারণ
আদর্শ হিন্দু হোটেল
উপলখণ্ড
উর্মিমুখর
উৎকর্ণ
নবাগত
ক্ষণভঙ্গুর
মেঘমল্লার
মৌরীফুল
যাত্রাবদল
জন্ম ও মৃত্যু
কিন্নরদল
বিপিনের সংসার
ইছামতী
অশনি সংকেত
কেদার রাজা
বিধু মাষ্টার
দৃষ্টিপ্রদীপ
তৃণাঙ্কুর
[illegible]

মুখোশ ও মুখশ্রী

বিকেল হয়নি ভাল করে।

তরলা লাইলাক রংয়ের ভয়েল শাড়ী পরে টেনিস কোর্টে বসে প্রতীক্ষা করচে মিঃ বাসুর। মিঃ বাসুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? বিখ্যাত টেনিস-খেলোয়াড় মিঃ বাসুর কৃশ, দীর্ঘ, সুন্দর, যৌবনশ্রী-মণ্ডিত চেহারা আলিপুর অঞ্চলের ও বালিগঞ্জ অভিজাত-পল্লীর প্রত্যেক টেনিস কোর্টকে অলঙ্কৃত করেচে—তাঁর নিখুঁত সাহেবী পোষাক ও নিখুঁততর আদবকায়দা অনেক ঈর্ষ্যাপরায়ণ তরুণের অনুসরণ-কেন্দ্র।

সেদিন বইয়ের এজেন্ট মিঃ সেনকে দেখে এরা বুঝেছিল এ তাদের সেটের লোক নয়।

অনিমা নাক সিঁটকে বলেছিল—ও, মি! টাইটার রং এমন বিশ্রী! টেষ্ট বলিহারি ভদ্রলোকের। ওই টাই পরে—ইট্ ইজ বিঅণ্ড্ মি! সুওরলি ওআন শুড্ নো হাউ টু ড্রেস প্রপারলি!

তরলা মুখে রুমাল দিয়ে বলেছিল—স্-স্ স্! নো ব্যাড্ রিমার্কস্ ডিয়ারি—যার যা তার তা।

—জানি। তবুও ওয়ান শুড্—

—হি—হি—হি—হি—

—তবে! তুমি নাকি বড়—হঠাৎ এত খুশী যে? ব্যাপার কি?

—জানি নে।

—আমি জানি। মিঃ বাসু আজ টেনিসে আসচেন। না?

—(সুরে) দেয়ার আর ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স্ ছাট্ রোম্ দি
গড-রোড্স্, গ্রীন্ আইড্—এ্যাণ্ড্ অ্যাফ্রেড্ অফ্ ম্যান্—

—থাক্ থাক্—বুঝেচি। ওয়াইল্ড্ ক্যাট্স্ দেয়ার আর এনাফ অ্যাণ্ড টু স্পেয়ার—বাট্—

—চুপ্।

—সত্যি, কিছু হবে না কি ?

—কি হবে ? (কৃত্রিম কোপে)

—বাঃ, রাগ কর। সুন্দর মানায়।

—নো ফ্ল্যাটারিং প্লিজ্—

—অ্যাট্ লিস্ট্ নট্ ফ্রম্ মি, কেননা তার চেয়েও ভাল সোর্স রয়েচে। না ?

—চুপ।

—বাস, চুপ করলাম। তরলা. সরলা কোথায় ?

—ওপরে আছে বোধ হয়।

—তার সেই হাঁদামুখো ভবঘুরেটা আজ নাকি কলকাতায় এসেচে শুনলাম। এখানে আসবে নাকি ?

—বোধ হয়। সরলা তো কাল রাত্রে ঘুমোয়নি তাব কথা ভেবে।

—পোষাক পরা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ভদ্রলোকেব। যে তা না জানে—

একে একে মেয়েরা এল, সঙ্গে সঙ্গে এলেন মিঃ দাস, মিঃ সেন, মিঃ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি। এঁদের কাজ হচ্ছে শুধু একটি আমোদের স্থান থেকে আর একটি আমোদের স্থানে যাতায়াত করা। এঁদের প্রত্যেকের নিজের মোটর আছে, এসেচেনও সেই মোটরে। জীবনে এঁদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে ভাল টেনিস খেলা যায়, স্টাইলের সঙ্গে টেনিস খেলা যায়। বিদেশের টেনিস-বিজয়ীদের নাম এঁদের মুখস্ত।

মিঃ সেন এদের মধ্যে এসেচেন বেশি দিন নয়, নিজের মোটর আছে, বিলিতি বই বিক্রেতাদের এজেন্ট। অর্থের দিক থেকে ভালই উপার্জ্জন, তবে সংসারও ছোট নয়, অনেক বুঝে চলতে হয়। ইনি স্ত্রীকে আনতে সঙ্কোচ বোধ করেন এখানে, কারণ তিনি একেবারে গ্রাম্য মেয়ে। এ দলে মেশবার উপযুক্ত নন।

সরলা নেমে এল ওপর থেকে। বেশ মেয়েটি, একটা সাদা সিল্কের শাড়ী, হাতে রিষ্টওয়াচ, চোখে চশমা, বেশ সাদাসিধে চালচলন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় কি একটা চিন্তা করচে অনেকক্ষণ থেকে।

অনিমা বল্লে—এসো সরলা। এত দেরি ?

—মাথা ধরেছিল।

—অসময়ে ?

—এই সময়েই তো ধরে। একটা এ্যাসপিরিন খেলাম—

—হার্ট ডিপ্রেসাণ্ট—বড়—

—হলে কি করবো ?

—খেলবে না ?

সরলা উত্তর দেবার আগেই দুটি ভৃত্য ট্রে হাতে ঢুকে সকলকে বরফ দেওয়া পানীয়, বরফশীতল ক্ষীর ইত্যাদি পরিবেশন করতে লাগলো। তরলা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—মিঃ দাসকে দাও। ও আপনার চলবে না ? কি দেবে ? আচ্ছা চা-ই নিয়ে এসো। আর কেউ চা ? সরলা, একটু ছাখ্ না ভাই ?

এমন সময়ে মিঃ বাসু লনে এসে ঢুকলেন। লম্বা, একহারা চেহারা, নিঁখুত পোষাক, নিখুঁত আদব-কায়দা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই। চালচলনের কায়দা ছায়াচিত্র-অভিনেতা মরিস সিভ্যালিয়রেব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যদিও মরিস্ সিভ্যালিয়রের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক কাল। সকলে চেয়ে দেখলে মিঃ বাসুর দিকে। তরলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—কিন্তু সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। মিঃ বাসু হচ্ছেন মল্লিক-বাড়ীর এ টেনিস ময়দানের সিংহ্। নামকরা খেলোয়াড়। কি করে টেনিস খেলতে হয় স্টাইলের সঙ্গে তা এখানকারই অনেকে এঁর কাছে শিখেছেন, যদিও মুখে স্বীকার করেন না।

মিঃ দাস বল্লেন—দেরী যে ! উই আর অল্ অ্যা-ওয়েটিং ইওর ভেরি প্রেশাস্ প্রেজেন্স্—

মিঃ বাসু বল্লেন—রি-য়্যা-লি !

—আস্ক্ দেম্—আস্ক দি লেডিজ্—

মিঃ বাসু বিলিতি কায়দায় মাজা থেকে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করলেন। মুখে কোনো কথা বল্লেন না। অতি চমৎকার দেখালো জিনিষটা কায়দার দিক থেকে। অনিমা লীলা সেনের কানে কানে বল্লে—আই কল্ ছাট্ স্মার্ট-নেস্, না ?

শীলা সেন মিঃ সেনের ভাগিনেয়ী, সুন্দরী ও সুগায়িকা, টেনিস্ খেলার হাত ভাল। মেয়েপুরুষের সম্মিলিত ক্রীড়ায় অনেক টেনিস ময়দানে দেখা যায়—ফিরিঙ্গি পাড়ায় এবং আলিপুর বালিগঞ্জে।

খেলা আরম্ভ হবার আর আর দেরি নেই। সবাই সবাইকার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় মত্ত, সরলা ছাড়া। সে বিমর্ষভাবে একটা পাম গাছের ছায়ায় বসে আছে তৃণভূমির কোণে। হঠাৎ কাকে দেখে সে যেন খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অনিমা চেয়ে দেখলে মিঃ সুর ওদিকেব গেট দিয়ে ময়দানে ঢুকচেন! মোটা সোটা লোক, একটু বেঁটে অথচ থল্‌থলে নয়, বেশ আঁটসাঁট গড়নের চেহারা। মুখে চোখে উদার হাসি। নস্যি রংয়েব সুট পরনে—ভাল মানায় নি—যেন বালিসের খোল-পরা-গোছের দেখাচ্ছে।

অনিমা নাক সিঁটকে জনান্তিকে বল্লে—বাব্বাঃ—কি লাউড কলার।

তরলা কৌতুকের সুরে বল্লে—আবাব পরচর্চ্চা। তোমাকে তো বলেচি, যার যা তার তা।

অনিমা চুপি চুপি বল্লে—সরলা বেচারীর জন্যে দুঃখু হয। আই ডু পিটি হার—

—তোমার কিছু করবার আছে?

—কিছু না।

—তা হোলে সেকথা ছেড়ে দাও। সরলাকে হি-ণ্ট দিয়েচি কতবাব। ও বোঝে না।

এই সময়ে মিঃ সেন বলে উঠলেন—ওয়েক আপ, লেডিজ—

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। মেযেরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। উঠলো না কেবল সরলা আর উঠলেন না মিঃ সুর। মিঃ সুরকে দু-একজন কৃত্রিম আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধও করলে, কিন্তু তিনি বল্লেন, খেলা তিনি জানেন না ভালো। তিনি শুধু দেখতে এসেচেন।

কিছুপরে খেলোয়াড়দল বিশ্রাম করতে এল। অমনি গৃহভৃত্য ছুটে এসে সকলের হাতে হাতে ঠাণ্ডা বার্লির জল, চা, বরফ-মিশ্রিত পানীয় বা কফি

পরিবেশন করতে লাগলো। মিঃ বাসুর নৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো চারিদিক। সকলে ঘিরে দাঁড়ালো মিঃ বাসুর চেয়ারের চারিদিকে।

মিঃ সেন বল্লেন—মিঃ বসু, ভাবছি আপনার শিষ্য হবো। আই উড বি প্রাউড টু বি ইওর ডিসাইপ ল্।

মিঃ বাসু বালিব জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কায়দার সঙ্গে সিগারেট ধবিয়ে বল্লেন—গুরু হবার কৃতিত্ব দাবী করতে পাবি নে।

অনিমা বল্লে—কি যে বলেন—

—কেন? মিথ্যে বললাম?

—অতিশয় বিনয়েব কথা হোল। আপনার যা হয়েচে, ক'জনেব ও রকম সৌভাগ্য ঘটে? আপনার খেলা দুচোখ ভবে দেখলেও আই উড্ থাষ্ট্ ফর মোব—

—ধন্যবাদ।

—না, সত্যি বলচি, আমাকেও আপনি শিষ্য কবে নিন না?

—শিষ্য? ব্যাকবণ ভুল হ'ল, শিষ্যা হবে কথাটা।

—যা বলেন। না সত্যি, কবে নিন না শিষ্যা?

—তথাস্তু।

সকলে হেসে উঠলো। তরলা বল্লে—কথা বলবাব কি সুন্দর ভঙ্গি। ও-ও শিখতে হয় আপনার কাছে।

অনিমা বল্লে—একশো বার।

মিঃ সেন বল্লেন—বাঃ, আমি কথাটা তুললাম, আব আপনি ও তবলা দেবী কথাটা একচেটে করে নিলেন দেখছি।

মিঃ বাসু হেসে বল্লেন—লেডিজ্ প্রিভিলেজ—

এই সময়ে পুনরায় খেলা আরম্ভ হওয়াব সময় হোল। সবাই যে যার জায়গায় খেলতে উঠে চলে গেল। মিঃ বাসু নিজের র‍্যাকেটের তাঁতগুলোতে হাত দিয়ে বল্লেন—একখানা ভালো র‍্যাকেট দিতে পারেন কেউ? পাটগুলো ঢিলে হয়ে পড়েচে। দুটো ছিঁড়ে গিয়েছে—বড্ড অসুবিধে হচ্ছে—

তরলা বল্লে—এই নিন আপনি আমার-খানা।

—আপনি ?

—আমি আনিয়ে নিচ্ছি—

অনিমা বল্লে—না হয় আমারটা নিন—

—না থাক। দুজনকেই ধন্যবাদ। এবারটা আমি এতেই চালিয়ে নোবো।

তারপর মিঃ সুরকে দেখিয়ে চুপি চুপি বল্লেন—ও ভদ্রলোকটি কে ?

অনিমা চুপি চুপি উত্তর দিলে—একটি নিরীহ ভদ্রলোক।

—পরিচয় কি ?

—মিঃ সুর না সোম, কি জানি।

—ও, কি করেন ?

—ভবঘুরে। এ জেন্টলম্যান উইদাউট এনি ডিনোমিনেশন্—

—এখানে আগে কখনো তো দেখিনি ?

—অনেকবার এসেচেন। মাঝে মাঝে আসেন। সরলা ওঁকে পছন্দ করে।

—রি-য়্যা-লি ?

—শুন্চি। আসুন, ইন্ট্রোডিউস্ করে দিই, না ?

ওরা সকলে আবার খেলতে গেল। এরা নিজের ভাবেই নিজে বিভোর হয়ে আছে, তরলা একটা নীল রংয়ের স্কার্ফ রিফ নট্ করে বেঁধে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে র‍্যাকেট হাতে। মিঃ বাসু খেলার বিষয়ে কি একটা কথা তাঁর পার্টনার অনিমাকে বলচেন। অনিমার চোখে সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি। এখানে যে ক'টি মেয়ে আছে, এদিকে এরা, ওদিকে মিঃ সেনের বড় মেয়ে মৃদুলা, শ্যালিকা মঞ্জুশ্রী—সুনিপুণ খেলোয়াড় মিঃ বাসুকে এরা ইষ্টদেবের আসনে বসিয়েচে। একটুখানি খেলা বন্ধ হোলেই মিঃ বাসুর চতুর্দ্দিকে তরুণীরা মুগ্ধনেত্রে ভিড় করে দাঁড়াবে এবং রজত-বিগলিত কণ্ঠের কলধ্বনি সুরু হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। মিঃ সুর একটি সিগারেট নিয়ে সবে ধরিয়েচেন, এমন সময় সরলা এসে ওঁর কাছে বসলো। বল্লে—কি ভাবচেন ?

—ভাবচি মিস মিত্র, আমি খেলতে পারি নে কেন ?

—শেখেন নি কেন ?

—সময় পাইনি। সত্যি বলচি। এক সময় ভেবেছিলাম ক্যামেট্ পর্ব্বতচূড়ায় উঠবো। চেষ্টা করেছিলাম সেদিকে। একবার ভেবেছিলাম নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠবো—এশেন্ ব্রেনার যে বছর মারা গেল নাঙ্গা পর্ব্বতের চার নম্বর ক্যাম্পে, আমি তখন সেই ভীষণ স্নো-ষ্টর্মের মধ্যে তিন নম্বর ক্যাম্পে আছি। আমার মাথার ওপর বিরাট নাঙ্গা-পর্ব্বতের খাড়া চালু—চারিপাশ গুঁড়ো বরফে আচ্ছন্ন, কিচ্ছু দেখা যায় না—

—বলুন, বলুন—কি ভালোই লাগচে—

—এমন সময় নেপালী ক্যাম্প ফলোয়ার টুটি থাপা এসে বল্লে—সব খতম্ হো গিয়া হুজুর—আমি আর একজন জার্ম্যান—ওটা ছিল জার্মানদের অভিযান—আবার উঠতে লাগলাম চার নম্বর ক্যাম্পে—

—সেই বরফের ঝড়ের মধ্যে ?

—না। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে যখন বরফের ঝড় কমলো, তখন—

—আপনার কথা শুনে মনে হয় এরা কি সব ছোট জিনিস নিয়ে থাকে। এদের এই খেলা, সো-কল্‌ড্ স্মার্টনেস্, এদের ইংরিজি বুলি আমার এত খারাপ লাগে। বড় জিনিসকে নিয়ে, বড় কল্পনাকে নিয়ে যদি না থাকতে পারা গেল তবে মানুষ হয়ে জীবনের সার্থকতা কি ?

মিঃ সুর হেসে বল্লেন—আমাকে ঘরছাড়া করেচে আজ কিসে ? কবে হয়তো ওই বিরাটের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তারপর থেকে শুধু মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, বনে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি—কিসের যে নেশায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়! কতবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেচি। মরুভূমিতে দিক্‌হারা হয়ে জলের অভাবে মরণের অর্ধেক পথে পৌঁছে ফিরে এসেচি। সে সব গল্প একদিন করবো মিস্ মিত্র—নিরিবিলি বসে। আজ এই টেনিস খেলার মাঠ তার উপযুক্ত স্থান নয়।

—শুধু আমাকেই বলবেন কিন্তু—

—আর তো কেউ শুনতে চায় না। এখানকার আর তো কারো শোনবার আগ্রহ নেই, আপনাকেই বলবো।

—বসুন। আপনার জন্যে কি আনবো?

—কিছু না।

—আইস্‌ক্রিম খান একটু—

—ধন্যবাদ। আপনি বসুন, ব্যস্ত হবেন না।

এই সময় খেলা ভাঙ্গলো। তরলা, অনিমা ও মিঃ বাসু একসঙ্গে এসে ওদের ডান পাশের চেয়ারগুলো দখল করলে। মঞ্জুশ্রী ও খুকী সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিমা মিঃ বাসুকে বল্লে—বার্লি ওয়াটার?

—থ্যাঙ্ক স্। আধ গ্লাস—

সরলা এই সময় অনিমাকে বল্লে—অনি মিঃ সুরের জন্যে একটা আইসক্রিমের কথা অমনি বলে দাও না—

মিঃ বাসু গলার স্বর নীচু করে বল্লেন অনিমাকে—আইসক্রিম। মেয়েদের খাদ্য বলেই ওটাকে আমার জানা আছে।

অনিমা বল্লে—সবাই সমান পুরুষ মানুষ হয় কি?

—কি নাম বল্লেন সরলা দেবী?

—আমি শুনিনি ঠিক! অন্যমনস্ক ছিলাম—

তরলা বল্লে—মিঃ সুর। আসুন, ইন্ট্রোডিউস করে দি?

অনিমা চোখ টিপে বারণ করে বল্লে—থাক।

মঞ্জুশ্রী হেসে বল্লে—কেন?

অনিমা বল্লে—সকলের সঙ্গে সকলের মিশবার যোগ্যতা থাকে কি? আমাকে তুমি যাই বলো মঞ্জু, হয়তো তুমি দোষ দিতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় পুরুষ যদি পুরুষের মত না হয়, তেমন স্মার্ট না হয়, তাহোলে জবুথবু জবড়জং ধরণের—

তরলা হি-হি করে হেসে বল্লে—আর একটা বিশেষণ বাদ দিলে সেটা হোল—

মঞ্জু অমনি টপ্ করে বলে ফেল্লে—জ—র—দ—গ—ব—

তরলা মুখে আঙ্গুল দিয়ে বল্লে—স্—স্—স্

এই সময়ে ভৃত্য বার্লির জল, আইসক্রিম প্রভৃতি ট্রে ভর্ত্তি করে নিয়ে এসে তরলার সামনে ধরলে। তরলা ও অনিমা ট্রে থেকে খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিয়ে যার যার হাতে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সকলের আগে মিঃ বাসুকে ও সর্ব্বশেষে মিঃ সুরকে দেওয়া হোল।

ঠিক এই সময়ে একখানা টু-সিটার অস্টিন্ ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। তা থেকে নেমে মিঃ দে আর তাঁর কন্যা শকুন্তলাকে দেখা গেল টেনিস কোর্টে ঢুকচেন।

মিঃ দে এ-সমাজের চূড়ামণি, পৌরসভার ডেপুটি মেয়র, কলকাতা হাই-কোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার, বড় কংগ্রেসী·পাণ্ডা, সাহিত্যিক ও বক্তা। এদের দলে যখন মেশেন, তখন এরা বিনয়ে বিগলিত হয়ে থাকে সর্ব্বদা। ওঁরা টেনিস কোর্টে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলে।

—এই যে মিঃ দে, এই যে মিস্ দে—আসুন, আসুন—সো গুড্ অফ ইউ টু—

—মিস দে-কে যে বড্ড টায়ার্ড দেখাচ্চে—বসুন—বসুন—ইত্যাদি।

তরলা বল্লে—শকু দিদি—সেই হাজারিবাগ আর এই। কতদিন—

হঠাৎ মিঃ সুরের দিকে চোখ পড়াতে মিঃ দে যেন অবাক হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আপনি।

শকুন্তলাও এগিয়ে এসে বল্লে—মিঃ সুর! সত্যি আপনি—

মিঃ সুর দাঁড়িয়ে উঠে ওঁদের অভিবাদন করলেন। বল্লেন—আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। তবে মধ্যে পাঁচ ছ'মাস আসিনি—

মিঃ দে বল্লেন—আসবেন কেমন করে? আপনার কথা যে কাগজে বেরিয়েচে আজ—আপনার ছবি পর্য্যন্ত বেরিয়েচে। শকুন্তলা কাগজখানা গাড়ি থেকে নিয়ে এসো তো মা—সিন্ধুনদীর গর্জ্জ—আর কেউ বিজয় করেনি এক ফ্রাঙ্ক নর্টন বাদে। বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেচেন আপনি।

মিঃ সেন বল্লেন—ইনি কি করেচেন বল্লেন?

মিঃ দে বল্লেন—ইনি হোলেন বিখ্যাত পর্য্যটক ব্যোমকেশ সুর। এঁর কথা

'ইউ পি'র সমস্ত কাগজে। আমি পরশু লক্ষ্ণৌ থেকে আসচি। সিন্ধু নদীর বিরাট খাত ইনি একা বেড়িয়ে এসেচেন—কি দুর্গম পথযাত্রা সে! শকু মা কাগজ এনেচো? এই দেখুন এঁর ছবি। পড়ে দেখুন সবটা—বাঙ্গালীর মুখ একশোবার উজ্জ্বল করেচেন আপনি। ফ্রাঙ্ক নর্টনের পর এ দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করে নি—সকলে বুঝতে পাববে না ইনি কি করেচেন—বাঙ্গালীব মধ্যে এত বড—

মিঃ সেন বল্লেন—কবে গিয়েছিলেন?

মিঃ দে কাগজখানা খুলে সকলের দিকে ফিরিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—দেখুন। এই তো সেদিন ফিরেচেন; আজ দিন দশ-পনেবো হোল। এই দেখুন এঁর ফটো—মিঃ সুর আমাদের কাগজে ধারাবাহিক ভাবে আপনি সিন্ধু অভিযান লিখুন—পাঁচহাজার টাকা অফার রইল আমাব। —স্টেট্‌স্‌ম্যান জানে না যে আপনি কলকাতায়। তা হোলে এখুনি লুফে নেবে—আমার অফাব রইল কিন্তু মিঃ সুর—

শকুন্তলা মুগ্ধদৃষ্টিতে মিঃ সুরেব দিকে চেয়ে বল্লে—কাল আমাদেব বাড়ি আসুন মিঃ সুর। গল্প শুনবো আপনার মুখে। কেমন তো?

অনিমা ও তরলা হাঁ করে এদের দিকে চেয়ে দাঁডিয়েছিল। এই সময় মিঃ বাসু এসে ওদের দুজনকে চুপিচুপি বল্লেন—আমি আসি। একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে এখুনি—আচ্ছা—গুড্ নাইট—

রাসু হাড়ি

সে বার আষাঢ় মাসে আমাদের বাড়ি একজন লোক এসে জুটলো। গরীব লোক খেতে পায় না, তার নাম রাস্থ হাড়ি। আমরা তাকে সাত টাকা মাইনে মাসে ঠিক করে বাড়ির চাকর হিসেবে রেখে দিলাম। প্রধানতঃ সে গরু বাছুর দেখাশুনো করতো, ঘাস কেটে আনত নদীর চর থেকে, সানি মেখে দিত খোল জল দিয়ে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন আমাদের অল্প বয়সে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই বড়, লেখাপড়া আমার গ্রাম্য পাঠশালা পর্য্যন্ত। ছোট ভাই দুটি ডাণ্ডাগুলি খেলে বেড়াতো, এখন চাষের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

রাস্থ বছরখানেক কাজ করার পরে একদিন রাত্রে আমাদের বড় বলদজোড়া নিয়ে অন্তর্দ্ধান হ'ল। আমাদের চক্ষুস্থির, তখনকার সস্তার দিনেও সে গরুজোড়ার দাম দু'শো টাকা। আমার ছোট ভাই সত্যচরণের (ডাক নাম নেণ্টু) বড় সাধের বলদ, সে ভাল গাড়ী চালাতে পারতো বলে সখ করে জঙ্গিপুরের গোহাটা থেকে ওই গরুজোড়া কিনে এনেছিল।

ভোরবেলা মা ওঠেন সকলের আগে। সেদিন উঠে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখেন রাস্থ নেই—যে কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুতো সেখানাও নেই। গোয়ালে দেখেন বড় বলদজোড়াও নেই।

আমাকে উঠিয়ে বল্লেন—হ্যাঁরে নীলে, রাস্থ গেল কোথায় জানিস ?

আমার তখন বিয়ে হয়নি, সত্য আর আমি এক ঘরে শুই। আমি উঠে চোখ মুছতে মুছতে বল্লাম—তা কি জানি ? মাঠের দিকে গেল না তো ?

—এত ভোরে সে কোনদিন মাঠে যায় না, আজ গেল কেন ? বড় গরু-জোড়াও তো দেখচি নে।

—গরুকে কি মাঠে খাওয়াতে নিয়ে গেল ?

—এত সকালে আর এই শীতে ? কখনো তো যায় না।

—তাইতো। দাঁড়াও উঠি আগে।

বহু খোঁজাখুজি করা হ'ল সারাদিন ধরে।

রাসু হাড়ি না-পাত্তা। নির্ঘাত ভেগেছে গরুজোড়া নিয়ে। অমন গরুজোড়া।

সত্য তো পাগলের মত হয়ে গেল। ওর গায়ে খুব জোর, খুব সাহসী আর তেজী ছোকরা। বল্লে—দাদা, চলো ওর বাড়ি সেই বেলডাঙ্গা যাবো।

—কে যাবে?

—তুমি আর আমি।

—জানিস ওর বাড়ির ঠিকানা?

—বেলডাঙ্গা থানা, মাঠডা-বেনাদহ গ্রাম। ও জবাব চিঠি পাঠিয়েচে ওই ঠিকানায়।

—ডাকঘর?

—ওই বেলডাঙ্গা। জেলা মুর্শিদাবাদ।

—বাবাঃ, সে কদ্দুর এখেন থেকে! ও থাকগে।

সত্য কিছুতেই শুনলো না। তার পীড়া-পীড়িতে দুই ভাই পুঁটুলি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। বত্রিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

সোজা গিয়ে বেলডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নামলাম।

জিগ্যেস করে জানা গেল মাঠডা-বেনাদহ এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। বেলডাঙ্গার থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সব খুলে বল্লাম। তাঁর নাম পঞ্চানন রায়, বাড়ী হুগলী জেলা। আমাদের মুখে সব শুনে তাঁর দয়া হ'ল। আমাদের বল্লেন, সেখানে কিছুদিন থাকতে, অন্ততঃ এক সপ্তাহ। সাধারণ পোষাকে তিনি দু'জন কনেষ্টবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেনাদহ গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, সে বাড়ি নেই।

আমাদের বল্লেন—থানায় রাত্রে শুয়ে থাকবেন, কোন অসুবিধে হবে না। রেঁধে খেতে পারেন। কিম্বা যদি না রেঁধে খেতে চান, আমার এক ছত্রি কনষ্টেবল আছে—

সত্য বল্লে—কিছু না দারোগাবাবু, আমরা রান্না করেই নেবো।

থানার উত্তরে বড় এক পুকুর, পুকুরের পাড়ে উলুটি বাচড়া ও তাল গাছ। আমাদের যশোরের ভাষায় উলুটি বাচড়া বলে উলুঘাসে ঢাকা মাঠকে। দেখে সত্য খুব খুশি। বলে, দাদা ওই তাল গাছের তলায় আধ-ছায়া আধ-রৌদ্রে বসে রাঁধবো।

দিন কয়েক সেখানে থাকা হ'ল, বেনাদহ গিয়ে রাস্থ হাডির সন্ধান সব সময়ে নেওয়া হচ্ছে। কখনো রাত দুপুরে, কখনো দিন-দুপুরে, কখনো খুব ভোর বেলায়। গাঁয়ের লোকে বল্লে সে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণদের বাড়ি চাকরি করে। এখানে থাকে না তো। আজ এক বছরের মধ্যে তাকে গাঁয়ে দেখা যায় নি।

সুতরাং সাত দিন পরে আমরা রাস্থ হাডিকে অপ্রকট অবস্থায় রেখেই বেলডাঙ্গা থেকে রওনা হলাম বাড়ীর দিকে।

সত্য বল্লে—দাদা পয়সা নেই হাতে, তা ছাডা রাস্তা দেখে যেতে হবে, যদি এমন হয় পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে আসচে। চলো হেঁটে বাড়ি ফিরি।

—সে কি রে, এখান থেকে যশোর জেলা, পথটি যে সোজা নয়—পারবি হাঁটতে?

—গরুজোড়া ফেরত পাওয়ার জন্যে সব করতে পারি দাদা। আমার গাড়ি চালানো একদম বন্ধ হয়ে গেল ওই গরুজোড়ার অভাবে।

অতএব নামলাম দুই ভাই পথে।

বেলডাঙ্গার বাজার থেকে চালডাল কিনে নিই। হাঁড়ি-সরা কিনে বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। প্রথম দিন রাস্তার ধারে এক আমতলায় রান্না করে খেলাম। বেশ লাগে কিন্তু এভাবে পথ চলতে। ঘর থেকে কখনো বেরুইনি, এতদূরেও জীবনে কখনো আসিনি, রাস্থ হাডির দৌলতে অনেক দেশ দেখলাম।

সত্য বল্লে—দাদা, হাঁডি ফেলে দিয়ে কাজ নেই। বড্ড দাম হাঁড়ির। ধুয়ে নিয়ে আসি পুকুর থেকে, বোঁচকায় বেঁধে নিই। নইলে কত পয়সা লেগে যাবে হাঁড়ি কিনতে।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় নেবার জন্যে একটা কি গ্রামে ঢুকে সামনের একটা বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীর লোকেরা ঘুঁটের আগুন পোয়াচ্ছে উঠোনে।

আমাদের কথা শুনে বললে এখানে জায়গা হবে না। আমাদের তাই থাকবার জায়গা নেই—এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে দ্যাখো গে—

কিছুদূর গিয়ে আর একটা বাড়ি পেলাম রাস্তার বাঁ-ধারে। বাড়ির সামনে গোয়ালঘর, প্রথম শীতে মাচাভরা লাউ গাছে লাউ ঝুলচে। মেটেঘব দু'তিনখানা, উঠোনের পেছন দিকে এক ঝাড় তলদা বাঁশ। বুড়ো-মত একটা লোক তামাক খাচ্ছিল দাওয়ায় বসে। আমাদের দেখে বল্লে—কে তোমরা ?

আমি বল্লাম—পথ-চলতি লোক।

—এখানে কি মনে করে ?

—একটু থাকবার জায়গা দ্যাও কর্ত্তা। অনেক দূর থেকে আসচি, বড কষ্ট হয়েচে।

—তোমরা ?

—আমরা ব্রাহ্মণ।

—গিয়েছিলে কোথায় ?

তখন সব কথা খুলে ওকে বল্লাম। রাসু হাডিব আনুপূর্ব্বিক ঘটনা। লোকটা নির্ব্বিকার ভাবে তামাক টানতে টানতে সব শুনলে। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে পিচ্ করে থুতু ফেলে শান্ত ও ধীরভাবে বল্লে—এখানে থাকার অসুবিধে। আগে দ্যাখো—

—এই দাওয়াটায় না হয় শুয়ে থাকবো। এই শীতে—

—এখানে সুবিধে হবে না।

সত্য বল্লে—এগিয়ে চলো দাদা। এখানে দরকাব নেই—

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বাড়ির পেছন দিকটাতে পৌছলাম। বাড়ির মধ্যে মুড়ি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে এবং খোলা হাঁড়িতে মুড়ি ভাজার চড়্বড়্ শব্দ হচ্চে। আমরা ঘুরে গিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকলাম। একটা কালোমত বেঁটে লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে কটমট করে চেয়ে বল্লে—কে তোমরা ? কি চাই ?

—আমরা বিদেশী পথিক, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি। একটু থাকবার জায়গা হবে রাত্তিরে ?

—কি জাত তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ। আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে, নিজেরা রেঁধে খাবো।

লোকটা যেন একটু নরম হয়ে বল্লে—দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি—

বাড়ীর মধ্যে থেকে এবার বেরিয়ে এল একটি মেয়েমানুষ, কালো, ঢেঙা, হাতে কুঁচিকাঠি। ইনিই মুড়ি ভাজছিলেন তা হ'লে। আমাদের দিকে চেয়ে বল্লে—কে গা তোমরা ?

—আমরা ব্রাহ্মণ একটু থাকবার জায়গা চাই।

—এখানে জায়গা হবে না। আগে দ্যাখো—

—আগে কোথায় দেখবো ?

—ওমা, তোমরা জানো না নাকি ? আগে কত লোক আছে—দ্যাখো গে যাও—

—আমরা নতুন লোক। কি করে জানবো লোক আছে কি না।

—সামনে এগিয়ে দেখ না।

—জায়গা একটু হবে না ? আমরা নিজেরা রেঁধে খেতাম।

—বার বার বলছি হবে না, তুমি বাপু কি রকম লোক ?

বলেই মেয়েমানুষটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে একপাক ঘুরে চলে গেল বিরক্তভাবে।

সত্য বল্লে—দাদা উপায় ? কেউ তো জায়গা দেয় না দেখচি। রাত বেশ হ'ল।

—চ'ল দেখি এগিয়ে।

—আমাদের কি চোর-ডাকাত ভাবচে নাকি ?

—কি ক'রে বলবো, চল্ দেখি এগিয়ে।

এবার একটা পাকা দালান-বাড়ির বাইরের রোয়াকে আমরা ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়লাম বোঁচকা নামিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একজন লোক বাড়ী

থেকে বের হয়ে কোথায় যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে, আমাদেব দেখে বিস্ময়ের ভাবে বল্লে—কে তোমরা ?

আমি বল্লাম—একটুখানি শুয়ে থাকবার জায়গা দেবেন রাত্তিরে ? আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ী যশোর জেলা, বেলডাঙা থেকে আসচি—

—হেঁটে আসচো ?

—হ্যাঁ।

—তা থাকো শুয়ে।

ব্যস্, এই পর্য্যন্ত। বল্লে না যে উঠে বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে শোও, কিম্বা তোমরা খাবে কি, কিছু না। সেই যে গেল, আর তাকে দেখলামও না। আব কোন খোঁজখবর ও নিলে না আমাদের।

সেই শীতের রাত্রে খোলা রোয়াকে কাপড পেতে দুই ভাই শুয়ে রইলাম—কি করি !

সত্য বল্লে—রাস্থ হাডির সঙ্গে একবাব দেখা হ'ত, তাব মুণ্ডুটা ভেঙে দিতাম এক ঘুষিতে—

সত্য বেশ জোয়ান ছোকরা, খেতেও পারতো অসম্ভব। একসের রান্না-করা মাংস আর আধসের চালের ভাত একা খেতে পারতো।

বেলডাঙার বাজারে সস্তা ডিম দেখে ও বলতো—দাদা, রোজ চারটে ডিম এক একবাঁরে ভাতে দিও আমার জন্যে। খুব করে ডিম খেয়ে নিই—

আরও বেশি করে তার কথা মনে পডচে কারণ—

কিন্তু থাক সে সব এখন। আরও একদিন কাটল পথে।

বেথুয়াডহরি ছাডালাম। আরও এগিয়ে যাই দুজনে। জগদানন্দপুর বলে গ্রামের হাটে বড একটা মাছ কিনলাম, বেলা দশটার পরে। খিদেও পেয়েচে বেশ। একটা বড় পুকুরের ধারে আম গাছের ছায়ায় সত্য উহুন খুঁডতে লাগলো, আমি মাছ কুটবার ছাই কি ক'রে জোগাড করি তাই ভাবচি, এমন সময় সত্য বল্লে—ওই ত্যাখো দাদা—

যা দেখলাম তা এখনো মনে আছে। আজ এই চোদ্দ পনেরো বছর পরেও—

একটি সুন্দরী বৌ গামছা কাঁধে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পথের অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থমকে। আমরা রান্না করতে বসেছি পথের ধারেই। এই পথটা নিশ্চয়ই পুকুরঘাটে যাওয়ার পথ। বৌটি অপরিচিত লোকদের দেখে ঘাটে যেতে পারচেন না। ভদ্রলোকেব মেয়েদের স্নানের ঘাটে যাবার পথের ধারে আমাদেব রান্না করতে বসা উচিত হয়নি।

সত্য বল্লে—দাদা, ঘাটের পথে বসেচি, কি করি, উঠে যাবো?

হঠাৎ দেখি বৌটি যেন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিরে গেলেন। অমন রূপসী বৌ এমন পাড়াগাঁয়ে দেখবো আশা করিনি। আমাদের ভয়ও হ'ল। সত্য বল্লে—যাঃ, ফিরে চলে গেল বৌটি। আমরা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেচি—চলো সরে যাই—

পরক্ষণেই ভয়ের স্বরে বল্লে—দাদা, লোক আসচে এদিকে, বৌটি গিয়ে বাড়িতে বলে দিয়েচে—চলো পালাই—মারবে—

আমি আশ্বাস দিয়ে বল্লাম—কেন পালাতে হবে কেন? কি করেচি আমরা? মার বুঝি সস্তা?

দুটি ছোকরা এসে আমাদেব কাছে দাঁড়ালো, বল্লে—আপনারা আসচেন কোথা থেকে?

আমি বল্লাম—বেলডাঙা।

—যাবেন কোথায়?

—যশোর জেলা।

—আপনারা ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না। আমাদের খুড়ীমা (আমরা ভাবচি, এই রে! এইবার আসল কথা বলবে) এসেছিলেন ঘাটে নাইতে। তিনি ফিরে গিয়ে বল্লেন, দুটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের বাড়ীর সামনে উনুন খুঁড়ে রেঁধে খেতে যাচ্চে এই দুপুর বেলা। ওঁদেব গিয়ে বাড়িতে ডেকে আনো। তা আপনারা দয়া করে চলুন আমাদের ওখানে। আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্চি—

আমরা তো অবাক। এমন কথা বিদেশে কখনো শুনিনি। লোকে একটু শোবার জায়গাই দিতে চায় না, আর কিনা রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইচে। সত্য বল্লে—ও দাদা—

—কি ?

—যাবে নাকি ?

ছোকরা দুটি বল্লে—যেতেই হবে। খুড়ীমা নইলে ছাড়বেন না। আমাদের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে আপনাদের। নে বলাই, ওঁদের বোঁচকা দুটো তোল—

আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করি, সত্য আর আমি। আমাদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলে না ওরা, নিয়েই গেল। একতালা কোঠা বাড়ি, বাড়ির উঠানে ডান দিকে দুটো বড় গোলা, তার পাশেই গোয়ালবাড়ি, সামনে ছোট বৈঠকখানা। আমরা বাড়ির উঠানে পা দিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন—আসুন আসুন—আপনারা ব্রাহ্মণের ছেলে, এই দুপুর বেলা বাড়ির সামনে রেঁধে খাবেন, এ কখনো হয় ? বড় বৌমা দেখে এসে বল্লেন ওঁদের নিয়ে এসো বাড়িতে। আসুন, বসুন—

আমরা তত লেখাপড়া জানি নে, চাষবাস করে খাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে আমাদের ভয় হয়। বিশেষ করে তো সত্যর। সে গরুর গাড়ি চালায়, সে বল্লে—দাদা, এগিয়ে যাও—

এগিয়ে গেলাম আমিই।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। পা ধোয়ার জল এনে দিলে। তারপর এল চা আর জলখাবার। ফলমূল আর ঘরের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেল নাড়ু।

কর্তার নাম হরিচরণ সেন ; ওঁরা জাতে বৈদ্য। আমাকে বল্লেন—রান্না অবিশ্যি আপনাদেরই করতে হবে। স্নান করে নিন আগে।

সত্য বল্লে—তুমি রান্না করো গিয়ে দাদা। ওঁদের বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘর—আমার লজ্জা করে—

স্নান সেরে অগত্যা আমাকেই যেতে হ'ল রান্নাঘরে।

সেই সুন্দরী বৌটি দেখি সেখানে উপস্থিত। মুখের ঘোমটা খুলেছেন। সুন্দর মুখ। তেমনি কাঁচা হলুদের মত রং। আমার দিদির বয়সী হবেন, আমার ইচ্ছে হোতে লাগলো প্রণাম করবার। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ওঁরা বৈশ্য, কি মনে করবেন।

আমি বল্লাম—দিদি, আপনার বড় দয়া —

দিদি মুখের ঘোমটা আরও খুলে বল্লেন—দয়া কিসের? ওকথা বল্লে আমাদের পাপ হয় না? বলতে আছে? ছিঃ—

—না বলেও তো পারছিনে দিদি।

—না বলতে হবে না। রান্না করতে জানেন?

আমি হেসে বল্লাম—পারি নে তো করে খাচ্ছি কি করে হ্যাঁ দিদি? আমার ভাই বাইরে বসে আছে, সে আরো ভালো রান্না করতে পারে।

—কই তিনি বাইরে বসে আছেন কেন? ডেকে আনুন গিয়ে, দেখি কেমন রাঁধেন।

—সে আসবে না, বড় লাজুক।

—আপনার ছোট?

—পাঁচ সাত বছরের ছোট।

—ডেকে আনুন। আমি রান্নার জিনিসপত্তর আনি। ভাল রান্না করতে পারবেন তো?

—খুব।

জিনিসপত্র যা তিনি আনলেন, তা অনেক রকম। চাল, ডাল, ঘি, দুধ, আলু, বেগুন, কইমাছ। বল্লেন—সরুন, আমি কুটে বেছে দিই। ভালো কথা, আপনারা যে মাছ কিনেছিলেন, সে মাছটা ভালো না, পচা। সেটা কুটে ঝাল দিয়ে রান্না করতে দিয়েছি। ও মাছ আপনাদের খেতে দেবো না। বিদেশী লোক, পচা মাছ খেয়ে অসুখ বিসুখে পড়বেন শেষকালটাতে। সে হবে না বাপু—

—একদম পচা ? আমি কিনিনি, সত্য কিনেচে।

—ছেলেমানুষ, ঠকেছে। কই তাঁকে ডাকুন না।

—সে আসবে না দিদি। সে থাকুক বসে বাইরে। বড্ড লাজুক। ঘেমে উঠবে এখানে এসে। তা ছাড়া, আমরা হোলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু সুখ্যু বামুন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে মিশতে আমাদের লজ্জা হয়। আপনাকে দিদির মতো দেখেছি বলে কোনো লজ্জা হচ্চে না, কিন্তু অন্য জায়গা হোলে—

—সে কথা থাক। আপনি কি রকম রাঁধেন দেখবো—মাছের ঝোলে কি বাটনা দিতে হবে বলুন তো ?

—জানিনে। কখনো তো রাঁধিনি—

—বিদ্যে বুঝেচি। আচ্ছা আমি সব বলে দিচ্চি, আপনি বেঁধে যান। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েচে আপনাদের।

দুঘণ্টা ধরে তিনি বসে বসে আমায় দিয়ে রাঁধালেন। কখন মাছ ভাজতে হবে, কখন কি বাটনা কিসে দিতে হবে, সাঁতলাবাব সময় কি ফোড়ন দিতে হবে। দুধ নিয়ে এলেন প্রায় দেড সের। পায়েস করতে হবে নাকি। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকাব করলাম—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

তিনি বল্লেন—তা ভালো, থাক, খিদেও পেয়েছে আপনাদের, বুঝতে পারচি। ওবেলা হবে।

আমি একটু আধটু গান করতে পারতাম। বিকাল বেলা আমার সে বিদ্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো আমার ভাইয়ের মুখ থেকে। সন্ধ্যার পরে এল হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা। আমাব গান শুনে অনেকে সুখ্যাতি করতো তখন। গান ভালই গাইলাম। বাত্রে রান্না করবার সময় দিদি বল্লেন—আপনি এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন ভাইটি ?

সলজ্জ সুরে বল্লাম—কি এমন গান ?

—আপনাকে এখন ছাড়চি নে। থাকুন দিনকতক এখানে। রোজ গান শুনবো।

—সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমার যে থাকবার জো নেই—পড়ে গিয়েছি এক ফেরে—

—কি ফের ?

আমি রাস্থ হাড়ির গরু চুরির বৃত্তান্ত আগাগোড়া বল্লাম।

দিদি সব শুনে গালে হাত দিয়ে কি চমৎকার সুশ্রী ভঙ্গী করে বল্লেন —ওমা, আমি যাবো কোথায় !

সুন্দরী মেয়ে, কি অপূর্ব্ব সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওই মুহূর্ত্তটিতে !

বল্লাম—আপনি তো দেবীর মত। কেউ জায়গা দিতে চায়না বিদেশী দেখে। তিন রাত কি কষ্ট পেয়েচি দিদি ! আপনার মত মানুষ ক'জন, যে রাস্তা থেকে লোক ধরে বাড়ি নিয়ে এসে খাওয়ায় ? আপনি বুঝতে পারবেন না মানুষ কত দুষ্টু হতে পারে।

দিদি হেসে বল্লে—আমার একটা সাধ ছিল—আপনি দিদি বলে ডেকে সে সাধ আমার পূরতে দিলেন কই ?

—কেন ? কি সাধ ?

—জানেন আমার অনেক দিনের সাধ ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের বাড়ি আসবেন, আমি তাঁর পা ধুয়ে দেবো নিজের হাতে—কিন্তু আপনার বেলা তা করতে পারলাম না। দিদি বলে ডাকলেন।

—সে আমাদের মত ব্রাহ্মণ নয় দিদি। আমরা চাষবাস করে খাই। লেখাপড়া জানিনে। আমাদের কথা বাদ দিন।

—তাতে আমার কি ? আপনি কি করেন আমাদের দেখবার দরকার কি ? যাক গে। এখন বলুন ক'দিন থাকতে পারবেন ?

—কালই যাবো।

—কাল যাবার কথা ভুলতে হচ্চে। পরশু বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন বলুন তো, মাংস খান তো ?

—খাই।

—শুনুন, কাল রাত্রে লুচি মাংস করবো। লুচি আমি ভাজবো, তাতে কোনো দোষ নেই—আপনি শুধু মাংসটা রেঁধে নেবেন।

—আপনি যখন দিদি, মাংস রাঁধলেনই বা—

—সে হবে না। ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না এ বাড়ীতে—

—বড্ড সেকেলে আপনি। ঠাকুমা দিদিমাদের মত সেকেলে। বলুন ঠিক কি না?

দিদি শুধু হাসলেন, কথার উত্তর দিলেন না।

পরদিনও পরম যত্নে আদরে কাটলো ওঁদের বাড়ি। সন্ধ্যার আগেই গানের ব্যবস্থা হ'ল। বাড়ীর মেয়েরা আড়ালে থেকে গান শুনলেন। আমি অনেকগুলো গান গাইলাম। রান্নাঘরে যেতেই দেখি দিদি গরম চা নিয়ে বসে আছেন। বল্লেন—বড্ড পরিশ্রম হয়েচে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিন। মেখে চুকে ঠিক করে রেখেচি। কসে নিন আগে। শুনুন. পেঁয়াজ দিইনি কিন্তু।

—কেন, আপনাদের পেঁয়াজ চলে না?

—আমাদের চলে। আপনাদের চলবে কি না—

—খুব চলে। দিন পেঁয়াজ বাটা—

—কি সুন্দর গান গাইলেন আপনি! সত্যিই চাষবাস করবেন?

—সত্যি। গান গাইলে চাষবাস করা যায় না, হ্যাঁ দিদি?

দিদি হেসে চুপ করে রইলেন। অনেক সময় কথার উত্তর না দেওয়া ওঁর একটা স্বভাব্।

পরদিন সকালেই আমরা দু'জন ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

দিদি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সত্যকে বসিয়ে শসাকাটা, কলা, শাঁক আলু, ক্ষীরের ছাঁচ ইত্যাদি রেকাবিতে সাজিয়ে সামনে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে সত্যি জল এল আমার। বার বার বলে দিলেন—আবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি! বেলুর বিয়ে হবে বোশেখ মাসে, সে সময় চিঠি যাবে। ভুলবেন না দিদির কথা।

আসবার সময় কর্ত্তাকে বল্লাম—দিদির মত মানুষ দেখিনি কর্ত্তামশায়—

বৃদ্ধ বল্লেন—বড় বৌমা তো? এ বাড়ীর লক্ষ্মী। ওঁর থেকেই সংসারের উন্নতি। উনি আসার পর থেকে সংসার যেন উথলে পড়লো। আর মা'র

আমার কি দয়া! পাড়ায় কেউ অভুক্ত থাকবে না। সব খবর নিজে নেবেন। দু'তিনটি ইস্কুলের ছেলেকে মাইনে দিচ্চেন এই পাড়ার। যে এসে ধরবে, 'না' বলতে জানেন না। মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। রূপে গুণে লক্ষ্মী।

ভুলিনি তার কথা।

আজ চোদ্দ বছর হয়ে গেল। এখনো মনে জল জল করচে সে মূর্তি।

আর সেখানে যাওয়া হয়নি। কোন খোঁজখবরও নেওয়া হয়নি।

আজ কেন একথা মনে উঠলো এতদিন পরে, বলি সে উপসংহারটি।

দিন পাঁচ-ছয় আগে আমার ভগ্নিপতি মনোমোহন রায় দফাদার সেই রাস্থ হাড়িকে গ্রেপ্তার ক'রে বিকেলবেলা আমার বাড়ীতে নিয়ে হাজির। রাস্থ হাড়ি জয়দিয়ার বাঁওড়ের ধারে শূওরের পাল চরাচ্ছিল—এখান থেকে এগার মাইল দূর। মনোমোহন থানায় হাজিরা দিতে যায় রোজ বৃহস্পতিবারে এই পথ দিয়ে। রাস্থ হাড়িকে দেখে চিনতে পেরেচে এবং চৌকিদার দিয়ে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করিয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছে। রাস্থ এসে বসে চারিদিক চেয়ে বল্লে—এঃ, বাবুদের বাড়ি এ কি হয়ে গিয়েচে? চণ্ডীমণ্ডপ নেই, গোলা নেই—কোঠা ভেঙে গিয়েচে। লাঙ্গল-গরুও নেই দেখচি।

আমার মাকে দেখে বল্লে—মা ঠাকরুন এত বুড়ো হয়ে গিয়েচেন? আপনাকে যে আর চেনাই যায় না। ছোটবাবু কই?

মা বল্লেন—সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে আজ আট বছর—সে চলে যাওয়াতেই তো সংসার একেবারে গেল। কিছু নেই আর সে সংসারের।

আমি বল্লাম—রাস্থ গরুজোড়া চুরি করিছিলি তুই?

রাস্থও বুড়ো হয়ে পড়েচে। মাথার চুল বিশেষ কাঁচা নেই। গোঁপ সম্পূর্ণ পাকা। একটু কুঁজোমত হয়ে পড়েচে।

একটু চুপ করে থেকে বল্লে—হ্যা বাবু। মিথ্যে বলে আর কি হবে? গরু নিয়ে গিয়ে একটা গাঁয়ের হাটে বিক্রি করি।

—দেশে যাস্‌নি?

—না বাবু, সেই টাকা নিয়ে সোজা রাজসাহী চলে যাই। ভয়ে দেশে ফিরিনি।

—কেন চুরি করলি?

—অদেষ্ট বাবু।. সবই অদেষ্টের লিখন। তখন বয়েস কাঁচা ছেল, বুদ্ধি ছেল না। দুঃখু তো ঘুচলো না, সব বকমই ক'রে দেখলাম, বাবু। এখন রাতুলপুরের হিঙ্গল সর্দ্দারের শূওর চরাই। যোল টাকা মাইনে আব খাতি ছায়। বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কনে যাবো এ বয়েসে—চকি ভালো দেখতি পাইনে—

মা বল্লেন—রাস্থ দুটো ভাত খাবি? হাঁড়িতে পান্ত ভাত আছে ও-বেলার। দুটো খা—বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয়নি?

জগদানন্দপুরের সেই দিদিব কথা অনেকদিন পরে আবাব মনে এল। ভুলেই গিয়েছিলাম বটে। এখন মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরের দিদির সেই দেবীর মত মূর্ত্তিখানা চোখেব সামনে ভেসে উঠলো। ভুলিনি দেখলাম, এতটুকু ভুলিনি। বাইরে ভুলেছিলাম মাত্র। কি জানি, এতদিন পরে বেঁচে আছেন কি না।

মনোমোহনকে বল্লাম—ভায়া, আব চোদ্দ বছর পরে ওকে গ্রেপ্তাব কবে কি করবে? ছেড়ে দাও ওকে। এখন ও যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব। ওকে জেলে দিয়ে আমাব আর দুঃখু ঘুচবে?

রাস্থ হাড়ি কেঁদে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

মা চোখ মুছতে মুছতে বল্লেন, আয় বাবা রাস্থ, ভাত দিইগে—রান্নাঘরের উঠোনে চল্—তোমারও অদেষ্ট—আমাদেরও অদেষ্ট—চল বাবা—

দৈব ঔষধ

আজ আর তরঙ্গিণী দেবীর কিছুই নেই।

কিন্তু এমন একসময় ছিল, যখন এই গ্রামের শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন তরঙ্গিণী দেবী। শুধু রূপসী নয়, বড়ঘরের বউও ছিলেন, এখন আর কিছুই নেই। এই গ্রামের বড় গাঁতিদার—ঘনরাম রায়চৌধুরী তাঁর স্বামী। জ্বলন্ত রূপ নিয়ে প্রথম যখন তিনি শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে আসেন, তখন তাঁর বয়েস পনেরো। সেকালে এতবছর-বয়েসে বিবাহ হোতোনা মেয়েদের কিন্তু তাঁর পিতামহ ৺রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ খুব ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। কন্যার চৌদ্দবৎসর বয়েসে বৈধব্যযোগ থাকায় স্নেহময় বৃদ্ধ ওই বয়েসটি পার করেই পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া ধার্য্য করেন।

যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসেন তিনি, তখন ঘনরাম রায়চৌধুরীর পিতা দয়ারাম রায়চৌধুরী জীবিত। নামে দয়ারাম হোলে কি হবে, ইনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রজাপীডক, কঠোর শাসক ও মামলাবাজ। আবার খুব উদারও যে ছিলেন, তার পরিচয় এই রাজীবপুরের অনেকে আজও মনে রেখেচেন। বাড়ীতে কুড়ি-বাইশটা ধানের গোলাতে ধান বোঝাই, অথচ, প্রজার কর্জ্জ-নেওয়া সামান্য ধানের জন্যে তাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে (গ্রামের লোকে বলতো 'কাছারীবাড়ি') এনে খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিতেন, মারধোর করতেন, মোকর্দ্দমা-মামলা ক'রে তাকে ভিটেচ্যুত করতে চাইতেন।

তরঙ্গিণী এসে দেখলেন, তিনি মস্ত-বড় প্রতাপশালী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ। শাশুড়িটি লোক ভাল নন, প্রতি কাজে সর্ব্বদা খিট্‌খিট্ করা, সবসময় কাজের খুঁত-কাটা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। তরঙ্গিণী খুব শান্ত-মেজাজের বধূ ছিলেন, শাশুড়ীর সমস্ত তিরস্কার বিনা-প্রতিবাদে শুনে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করতেন—একথা বলতে পারলেই বেশ শোনাতো বা মানাতো

বটে, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হোলো যে, তরঙ্গিণী আদৌ তা ছিলেন না। তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, সমানে-সমানে তর্ক-ঝগড়া করতেন। সেকালে এতে লোক ভালো বলতো না।

স্নেহময় শ্বশুর পুত্রবধূকে কাছে ডেকে বলতেন—শোনো বৌমা, ইদিকি এসো। শসা খাবা?

—না।

—কি খাবা?

—কিচ্ছু খাবো না।

—বোসো এখানে।

—কি বলুন?

—তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করচো কেন সকালবেলা?

—উনি আমায় বল্লেন, আমি বাটনা বাটতে জানিনে।

—বলচেন-বলচেন। উনি তোমার গুরুজন। তোমার কি তর্ক করা উচিত?

—না, উচিত না। আমি ছাড়বো কেন?

—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কথাবার্ত্তা বলতি নেই গুরুজনের সঙ্গে, ওতে লোকে নিন্দে করে'।

তারপর আরম্ভ হোতো সদুপদেশ—মহাভারতের দু'একটি সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোকের কাহিনী। ওঁর ছেলেবেলায়, একজন বড ভালো গৃহিণী এ-গ্রামে বাস করতেন, তাঁরও পুণ্য-কথা। সবই মুখে-মুখে। দয়ারাম রায়চৌধুরী বই-টই পডতে ভালোবাসতেন না। বাড়িতে পাঁজি ছাড়া অন্য বইও ছিল না।

এইসময় দয়ারামের স্ত্রী জগদম্বা এসে বলতেন—আমি বাপের বাড়ি যাবো, গাড়ি তৈরি করে দাও।

—কি হোলো?

—কিছু হয়নি। তোমার আদরের বৌমা নিয়ে তুমি থাকো, আমার

এ-সংসারে আর পোষাবে না। অকমান হতি এ-বাড়ি আমি থাকতি পারবো না।

এইসময় তরঙ্গিণী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠতেই জগদম্বা দেবী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—ওই দ্যাখো···দেখচো? আমার কথায় হেন হেনস্থা। আমি মানুষ নই! শুনলে?

তরঙ্গিণী তখনও মুখে কাপড়-গোঁজা অবস্থায় বললেন—'অকমান' কি কথা বাবা? অকমান মানে কি?

জগদম্বা দেবী অমনি আঁচলের চাবির গোছা খুলে ঝড়াং ক'রে স্বামীর সামনে ছুঁড়ে দিলেন—এই রইলো তোমার চাবি, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও—তোমার সোহাগের বৌমাকে নিয়ে তুমি থাকো—আমিও সব্বো চক্কত্তির মেয়ে জেনে রেখো। আমি এ-সংসারে অকমান হতি আসিনি—আসিনি—আসিনি···

গৃহিণী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দয়াময় বিব্রত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—আরে, শোনো—শোনো—সবাই হয়েছে আমার সমান। কি গেরোতেই পড়েচি বাপু—আচ্ছা বৌমা, আবার তুমি হাসচো! আবার হাসি কিসের? না, এরকম করলে আমাকে বেচে-কিনে কাশী রওনা হতি হবে দেখচি—

এইভাবেই তরঙ্গিণীর কৈশোর কেটে গেল। তারপর বৃদ্ধ দয়াময় রায়চৌধুরী একদিন শ্বাসরোগে দেহত্যাগ করলেন। ঘনরাম নিলেন বড় গাঁতি জমা ও প্রজাপত্রের ভার। কিন্তু সংসারে শান্তি ছিল না। জগদম্বা দেবী সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক হোতে চাইলেই প্রবল বাধা আসতো পুত্রবধূ তরঙ্গিণীর দিক থেকে! ঘনরাম রায়চৌধুরী নিজে পিতার মতই দুর্দ্দান্ত শাসক ও মামলাবাজ গাঁতিদার ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী বা মা কাউকে পেরে উঠতেন না। সেখানে নিত্য দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তরঙ্গিণী গ্রামের লোককে জিনিষপত্র দিতে ভালবাসেন, যার চাল অভাব তাকে ভাঁড়ার থেকে শাশুড়ীর অজ্ঞাতসারে চাল বার ক'রে দেন। যার কাপড় নেই তাকে নিজের বা শাশুড়ীর পুরানো কাপড় বার ক'রে দিয়ে দেন—এসব আবার জগদম্বা পছন্দ করেন না। গ্রামের

অভাবী-লোকেরা বধূকে ভালোবাসে, তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত ক'রে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা আবার জগদম্বাকে দেখতে পারে না।

গ্রামে একঘর জেলে আছে, অতি গরীব, নাম যদু জেলে। সেবাব ভীষণ বাদলাবৃষ্টি ভাদ্রমাসে। যদু জেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুখে প'ড়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। একদিন তরঙ্গিণীকে তেঁতুলতলায় ডেকে যদুর মেয়ে কম্‌লি বললে—কাকীমা, বাবা আপনাকে একবার বলতে বলচে, মোদের বড্ড কষ্ট। বাবা অসুখে প'ড়ে আছে, আমরা খেতে পাইনে—

—কি হয়েচে তোর বাবার?

—জ্বর হয়েচে।

—ডাক্তার দেখচে?

কমলা হেসে বললে—খেতি পাইনে তার ডাক্তাব। আজ চাল নেই ঘবে।

—চল্ আমি দিচ্চি। চুপি-চুপি পেয়ারাতলার জানলায গিযে দাডা। মা বাড়ি আছেন কিনা দেখি।

তারপর উঁকি মেবে দেখলেন, শাশুডী ঘাটে গিয়েচেন নাইতে, অমনি ভাঁড়ার থেকে চার কাঠা চাল-পূর্ণ একটি ধামা এনে পেয়ারাতলায় এসে কম্‌লিব হাতে দিয়ে বললেন—পালা!

কম্‌লি বাঁশবাগান ভেঙে ধামা-হাতে দৌড়েই পালালো।

ঝগড়াতে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সব-সময়েই তাঁর শাশুড়ী পরাজয় স্বীকার করতেন। অমন চোখা-চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগের সাধ্য জগদম্বা দেবীর ছিল না। ছেলে মায়ের দিকে থাকতো ব'লেই জগদম্বা চোখ রাঙিয়ে না হোক, কেঁদেও জিতে যেতেন।

সেবার ঘনরাম রায়চৌধুরী শান্তিপুরের কাছে এক জমিদারের অধীনে নায়েবী কর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন।

জগদম্বা বললেন—না। বাড়ি ছেড়ে বৌ নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ঘনরাম রায়চৌধুরী আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন—না নিয়ে গেলে, এখানেও তো তোমাদের—

জগদম্বা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—নিজে গিয়ে শাসন করো গে নিজের বউকে। নয়তো নিজে চ'লে যাও—সংসার কি ক'রে সায়েস্তা রাখতি হয়, তা আমি জানি।

তা সত্ত্বেও ঘনরাম বললেন—নিয়েই যাই নাহয় এ-বারটা। অনেকদিন এক জায়গায় রয়েচে—

মা বললেন—আমি মরবার আগে তো নয়! সে স্থবিধে এখন হবে না।

অগত্যা ঘনরামকে একাই চাকুরীস্থানে চ'লে যেতে হোলো।

সেবার শীতকালে দেশে চারিধারে বড্ড অস্থখ-বিস্থখ দেখা দিল। শীতের সন্ধ্যায় জগদম্বা অন্যমনস্কভাবে ব'সে আছেন দেখে তরঙ্গিণীর বড ছেলে প্রতুল জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুরমা, এমন ক'রে ব'সে আছো কেন?

—কিছু না। শরীরডা ভালো না—

—মাকে ডাকবো?

—না, ডাকতি হবে না। হেঁসেল ছেড়ে এখন এলি রান্না-বান্না হবে না।

—দেখি তোমার গা? একি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

—ও কিছু না, পিত্তির ধাত তাই। তুই গিয়ে প'ড়গে যা।

সেইরাত্রেই জগদম্বা দেবী বিষম অস্থখে পড়লেন। সংসারের অবস্থা ভালো, বাড়ীর গোমস্তা রামনাথ গাঙ্গুলী, প্রতুলের আহ্বানে অনেক রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠে এসে কর্ত্রীর হাত দেখে বললেন—জ্বর হয়েচে বেশ। নাড়ী খুব চঞ্চল। গুপী ডাক্তারকে ডাকবো?

কর্ত্রী ধমক দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ওইটুকু এখন বাকি আছে। এই বয়েসে ডাক্তারী-ওষুধ না গিললে চলচে না। ডাক্তার বাড়ি এলে, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেবো না? সারকুমারী মত করো।

অতএব সারকুমারী-মতে চিকিৎসা চললো। এদিকের পল্লী-অঞ্চলে এই একটি চিকিৎসাপদ্ধতি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। ননী বাগ্‌দী, নকুল মুচি প্রভৃতি সারকুমারী-মতের বড় চিকিৎসক। এরা গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে রোগী দেখে।

বিনিময়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এরা অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ব'লে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাশ-করা ডাক্তারেরা পেরে ওঠে না।

নকুল মুচি একটা বাঁশের চোঙা থেকে গোটা-দশ-বারো পুঁটুলি বার ক'রে বললে—মা ঠাকরোণের কি বড্ড জল তেষ্টা পাচ্চে ?

জগদম্বা বললেন—তা পায় বাবা।

—হুঁ। কি খাচ্চেন ?

—ওবেলা সাবু খেয়েছিলাম।

—সাবু খাবেন না। মোদের মতে ও চলবে না। খাবেন, পান্ত ভাত।

—কি খাবো বাবা ?

—আজ্ঞে, পান্ত ভাত।

—তারপর ?

—আগে ডোবায় ছেন কববেন, তাবপর পান্ত ভাত খাবেন।

প্রতুল বললে—হ্যাঁ। তা না হোলে জব-বিকাবেব সুবিধে হবে কিরকম ক'রে ?

জগদম্বা বললেন—ওকে বলতেই দাও না ভাই।

—আজ্ঞে, মোর বড়ি খেলি, ডোবায় ছেন করতি হবে, পান্ত ভাতও খেতি হবে।

—তাই হবে বাবা। তুমি ওষুধ দিও।

জগদম্বার জিদ বজায় রইলো। ফল এই দাঁড়ালো, সাবকুমাবী-মতে চিকিৎ-সার তৃতীয় দিনে রোগিণীব অবস্থা দাঁড়ালো এমন খারাপ যে, সাবাদিন ধ'রে গ্রামের শূদ্র-ভদ্র সবাই ভেঙে পড়লো বাড়িতে। অনেকে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতেও লাগলো।

গভীর রাত্রি।

তরঙ্গিণী শিয়রে ব'সে শাশুড়ীর সেবা করচেন। ঘনরাম রায়চৌধুরীকে কর্মস্থানে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

বড় মেয়ে রাণী বললে—মা, একটা কথা—

—কী ?

—বাইরে এসো। বলচি।

রাণী বাইরে এসে চুপি-চুপি বললে—মা, বুড়ী আর বাঁচবে না।

—তুই কি বুঝলি ?

—আমি তাই বুঝলাম। এবার সেই ওষুধটা শিখে নাওনা কেন ?

জগদম্বা নাকি কোনো সন্ন্যাসীর কথামত কাজ ক'রে রোগ মুক্ত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে লোক আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। জীবনে কত অম্লশূলগ্রস্ত রোগীকে যে তিনি ওষুধ দিয়েচেন···কত দূর-দূরান্তর থেকে রোগীরা এসে ওষুধ খেয়ে গিয়েচে। এ ওষুধ দেওয়ার একটা নিয়ম হ'চ্ছে এই যে, রোগীকে স্বয়ং এসে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ওষুধ তুলে বেটে দেবেন, জগদম্বা দেবী স্বয়ং।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ীর এ দৈব-ওষুধের কথা জানতেন। তবে রোগী তো সব-সময় আসতো না, কালেভদ্রে দু'পাঁচ বছর অন্তর হয়তো কোনোদিন একজন এলো। নিতান্ত দুরারোগ্য রোগ না হোলে কেউ বিদেশে ওষুধ আনতে যেতে চায় না।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—মা!

জগদম্বা ঘুমের ঘোর থেকে সদ্য-উত্থানের সুরে ব'লে উঠলেন—অ্যাঁ!

—মা, একটু কমলালেবুর রস দেবো ?

—উঁহুঁ···

—মিছরির জল ?

—উঁহুঁ···

—মা, একটা কথা। আমাকে সেই ওষুধটার কথা ব'লে দেবেন ? সেই দৈবওষুধটা ?

জগদম্বা দেবী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—ঘরে আর কে ?

—রাণী।

—ওকে যেতে বলো। ঘরে কেউ না থাকে।

রাণী চ'লে গেল। জগদম্বা দেবী বললেন—এই শোনো। আমার তখন সোমত্তবয়েস। অম্বলশূল রোগ হোলো। ছট্ফট্ করচি রোগের যন্ত্রণায়, এমন সময়—অনেক রাত্তিরি—দেখচি কি জানো—এক সন্নিসি এসে আমায় বলচে,তোর রোগ সেরে যাবে, তুই কাল সকালে উঠে অমুক-গাছের শেকড় তুলে এনে—

—কি গাছের শেকড় মা ?

এ-কথার উত্তর জগদম্বা আর ইহজীবনে দিতে পাবেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘনরাম রায়চৌধুরীব কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে মা'ব সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। তরঙ্গিণী দেবী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। ভোরের দিকে জগদম্বা দেবী পরলোকে প্রস্থান কবলেন।

তারপর অনেকদিন হ'য়ে গিয়েচে। সংসাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গিয়েচে। রাণীর বিবাহ হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে গিয়েচে। ঘনবাম রায়চৌধুরী বৃদ্ধ-অবস্থায় বাড়ি ব'সে আছেন। প্রতুল সামান্য মাইনেব চাকুরী করে, বিদেশে থাকে। সে জোলুস নেই সংসাবেব। তরঙ্গিণীও বৃদ্ধা।

এ-সময় একদিন জনৈক লোক এসে ঘোড়াব গাড়ী থেকে ওদেব বাড়ির সামনে নামলো। সঙ্গে একটি বৌ, দুটি ছেলে। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে একহাতে বুক চেপে ধ'রে এমনভাবে আস্তে-আস্তে বৌটির কাঁধে ভব দিয়ে আসতে লাগলো, যেন সে অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতব।

একটু পরেই জানা গেল, লোকটি অম্লশূলের বেদনায় কাতব হ'য়ে বহুদূর থেকে এসেচে। তরঙ্গিণী দেবী অম্লশূলের দৈব-ওষুধ জানেন, সে শুনেচে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন—মা, বড্ড দূর থেকে এসেচি আপনার নাম শুনে। আপনার এ-দয়া করতেই হবে—

লোকটিও বললে—না দয়া করলে মা, চলবে না। আমার প্রাণ বাঁচান আপনি—বড্ড আশা নিয়ে এসেছি—

তরঙ্গিণী বললেন—তোমরা জানলে কি ক'রে বাবা, যে, আমি অম্বলশূলের ওষুধ জানি ?

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। রাণীর বিয়ে হয়েচে তাদের দেশে। রাণীর ননদের মুখে একথা ভদ্রলোকের স্ত্রী শুনেচেন। তা-ছাড়া একথা কে না জানে, তাঁদের বাড়িতে অম্লশূলের বিখ্যাত দৈব-ওষুধ আছে ?

তরঙ্গিণী সব কথা ভেবে দেখলেন। তিনি যে শাশুড়ীর কাছ থেকে ওষুধ পাননি, একথা কাউকে বলেননি। রাণীকেও কখনো বলেননি একথা। রাণী শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নিশ্চয় মায়ের গুণের কথা অতিরঞ্জিত ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে থাকবে। খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে তরঙ্গিণী বললেন—আচ্ছা। ওষুধ দেবো বাবা, ব্যস্ত হয়োনা। সে তো কাল সকালে। আজ রাত্রে এখানে সবাই থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো। সেরে যাবে বাবা, কোনো ভয় নেই।

পরদিন খুব সকালে উঠে তরঙ্গিণী রোগীর স্ত্রীকে বললেন—আমার নাতনীকে সঙ্গে দিচ্ছি, তোমার স্বামীকে নদী থেকে নাইয়ে আনো। ওষুধ আমি বেটে রেখে দিচ্ছি।

বাড়ির পেছনের বনের মধ্যে ঢুকে তিনি একটা কাঁটানটের শেকড় তুললেন। মনে-মনে বললেন—কোনো অপরাধ নিওনা ঠাকুর। আমি কিছুই জানিনে—তোমার দয়ায় যেন ওর অসুখ সারে। এতদূর থেকে এসেচে কষ্ট ক'রে···

সেই কাঁটানটের শেকড় বেটে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। ওরা দু'জনেই চ'লে গেল।

দু'মাস পরেই রাণী শ্বশুরবাড়ি থেকে এলো। কথায়-কথায় একদিন মাকে বললে—আচ্ছা মা, পাচঘরার ভুবন মজুমদার তোমার কাছে ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল ?

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠলো। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন রে ? হ্যাঁ, একদিন একজন লোক আর তার বৌ এসেছিল বটে। পাঁচঘরা কি ক'ঘরা তা জানিনে। সে এক মজার কথা, সে হোলো কি বাপু—আচ্ছা, তুই তোর শ্বশুরবাড়িতে ওসব কথা এমন ক'রে—

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রাণী বললে—ভুবন মজুমদার পরশু আমার

শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। সে একদম সেরে গিয়েচে। দিব্যি চেহারা হয়েচে। বললে—তোমার মা আমার আর-জন্মের মা ছিলেন, আমার পুনর্জীবন দান করেচেন। সে কতো কথা। দু'খানা খেজুর গুড় দিতে এসেছিল, বলে—বৌমা, বাপের বাড়ি যাচ্চো, মাকে গিয়ে দিও। তা আমি বললাম, কোনো জিনিস নেওয়ার নিয়ম নেই, নিতে পাববো না। আমার শ্বশুরবাড়িব দিকে তোমার খুব নাম—

তরঙ্গিণীর কণ্ঠ থেকে কৈফিয়তের সুর মিশিয়ে গেল। মেযেব কাছে যেকথা বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বললেন না।

বারিক অপেরা পার্টি

সকালবেলা।

একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা মুসলমান আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে —সালাম, বাবু।

—কে তুমি ?

—আমার নাম বারিক মণ্ডল, বাড়ি চালদী। আপনার কাছে এট্টু আলাম—

—কেন ?

—ধানী জমি কিনবেন ?

পঞ্চাশের মন্বন্তর তখনো উগ্র হয়ে ওঠেনি, দিকে দিকে ওর আগমনবার্ত্তা অল্পে অল্পে ঘোষিত হচ্ছে। একটা ব্যাপার শেষ না হয়ে গেলে বোঝা যায় না সেটা কত বড় হোল। সবাই ভাবচে, এ দুর্দ্দিনের অভাব অনটন শীগ্‌গীর কেটে যাবে। এ সময়ে ধানের জমি কেনা মন্দ নয়, সামনেই শ্রাবণ মাস, জল-বৃষ্টিও বেশ হচ্ছে, কিনেই ধান রোয়া হতে পারে এবারই। চালের দাম পঁচিশ টাকা মণ, তাও সহজ প্রাপ্য নয়। কলকাতা থেকে বোমার ভয়ে পালিয়ে এসে বাড়ি বসে আছি। হয়তো কলকাতা শহর জাপানী বোমার ঘায়ে ছত্রাকার হয়ে যাবে; দেশেই থাকতে হবে বরাবর। দেশে ধানী জমির নিতান্ত অভাব, যা আছে, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলচে।

—বল্লাম—জমি কোথায় ? কতটা ?

—চালদীর মাঠে। তা বলি আপনার কাছেই যাই, ওঁর জমির যদি দরকার থাকে। সাত বিঘে জমি বাবু। বিক্রি করবে আমাদের গাঁয়ের সোনাই মণ্ডল।

—তুমি তার কেউ হও ?

—না বাবু। ওর মধ্যে দু'বিঘে ভিটে জমি আছে, সে জমি টুকতে আমি

খাজনা দিয়ে বাস করি। জমিটা কিনলে আমি আপনার ভিটের প্রজা হবো। দু'টাকা করে খাজনা করি। ধানের জমিটা আপনাকে সস্তায় করে দোব বাবু। আমাকে ধানের জমিগুলো কিন্তু ভাগে দিতে হবে। আর যদি আপনি নিজে চাষ করেন তো আলাদা কথা—

কলকাতা থেকে নূতন এসে বহুদিন পরে দেশে বসেছি, জমিজমার ব্যাপার তত বুঝিনে। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। চালদীর বারিক মণ্ডল আমার কাছে এসেচে কিছু জমি বেচতে। ওর জমি নয়, সোনাই মণ্ডলের জমি। ও এসেছে কেন, এতে ওর স্বার্থ কি? না, ও আগে থেকেই এই জমার অন্তর্ভুক্ত দু'বিঘে জমিতে বাস করে, জমি দিলে ও আমার প্রজা হবে এবং আমি ওকে ধানের জমির ভাগীদার করবো। বেশ কথা। বারিকের চেষ্টায় ও আমার ইচ্ছায় তিনদিনের মধ্যে জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজেষ্ট্রি আফিসে যে দলটি জমি রেজেষ্ট্রি করতে গিয়েছিল বারিক মুসলমান দেখলুম তার মোড়ল। মহা স্ফূর্ত্তিবাজ লোক সে। আধ-বুড়ো লোক হোলে কি হয়। দাড়ি নেড়ে নেড়ে পান খাচ্চে, বিড়ি খাচ্চে, বেগুনি খাচ্চে, ফুলুরি খাচ্ছে। রেজেষ্ট্রি শেষ হয়ে গেলে বারিক আমায় ডেকে বল্লে—বাবু এট্টুখানি দোকানে চলুন।

—কোন দোকান?

—জল খাবেন এট্টু।

জল খাওয়ানোর প্রথা আছে এদেশে, যে জমি কেনে, সেই মনের স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষী ও সনাক্তকারীকে মিষ্টি মুখ করায়। যে জমি বেচে সে তো রিক্ত হয়ে গেল। সে খাওয়াবে কেন? এ প্রথা তো এদেশে নেই। কিন্তু বারিকের আনাড়ি ধরণের বিনীত গ্রাম্য অনুরোধ এড়াতে না পেরে খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম।

—ছাও, ও দোকানী, বাবুরি (অর্থাৎ বাবুকে) নিমকি, সেঙ্গাড়া, সন্দেশ ছাও। আর ওই যে হাদে গোল গোল তোমার, ওকি বলে? ওই ছাও একপোয়া—লুচি খাবেন বাবু? হাদে বাবুরি লুচি ছাও আটখানা, ভাজা নেই? তা ভেজে ছাও—

দেড় টাকা খরচ গেল শুধু আমার পিছু; ওদেরও খাবার খরচ গেল টাকা চারেক। বারিক মহাস্ফূর্ত্তিতে এক টাকার খাবার নিজেই খেলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবাই মিলে অন্ধকারে বাড়ির দিকে রওনা হই। বারিক অন্ধকার পথে গান জুড়ে দিলে চেঁচিয়ে।

'ওগো হরি বংশিধারী শ্যাম লটবর—'

সোনাই মণ্ডল বাজার থেকে বড় দেখে দুটো ইলিশ মাছ কিনেচে, কারণ আজ তার হাতে করকরে আড়াইশো টাকা। জমি ওরা নাকি খুব সস্তায় দিয়েচে আমাকে। দলিল-লেখক আমাকে আড়ালে বলেছিল—আড়াইশ টাকায় সাত-আট বিঘের জমা কিনচেন, তার মধ্যে পাঁচ বিঘে আমন ধানের জমি। সাব-রেজিষ্টার বাবু এ দলিল এখন মঞ্জুর করলে হয়। দামটা কম বলে মনে হচ্চে কি না?

যাহোক, রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল, কোনো গোলমাল হয়নি।

বারিক মণ্ডল বল্লে—বাবু, আমাদেব গাঁ আগে, তাবপর আপনাদের গাঁ। এই অন্ধকারে কি করে যাবেন? সোনাই ইলিশ মাছ কিনেচে, আমাদের গ্রামে আজ থাকুন। ইলিশ মাছ রান্না করুন পেঁজ দিয়ে। পস্কাব লাসে আজ চলুন একটু স্ফূর্ত্তি করা যাক—

আমি রাজি হোলাম না। বাড়ি চলে এলাম অন্ধকারে।

বারিক আমার প্রজা হোল। তখন শুনলাম বারিক অপরের জমিতে বাস করতো, সে ভিটের খাজনা বহুদিন না দেওয়াতে জমিদার ওর বাড়ি (অর্থাৎ এক-খানা চালা ঘর) এবং এক জোড়া বলদ বিক্রি করে ক্রোক দেবার উপক্রম ক'রেছিল। তাই ও সে জমি ছেড়ে আমাব জমিতে নতুন করে চালাঘর বাঁধলো। আমার নতুন কেনা ধানের জমি ও-ই ভাগে চাষ করবার জন্যে বন্দোবস্ত করে নিলে। সেবার ধান রোয়া শেষ ক'রলে।

বারিক রোজ সকালে একবার ক'রে আমার বাড়ি ঠিক আসবে। এসে এ-গল্প ও-গল্প ক'রে উঠবার সময় কিছু না কিছু ছুতোয় টাকা চাইবে।

—বাবু—

—এসো বারিক। তামাক খাও।

—বাবু, বড্ড দায়ে পড়ে এ্যালাম। পাঁচটা টাকা দিতি হবে—

—কেন হঠাৎ ?

—আপনার জমিতি বাবমেসে চায দিযে রেখিচি। মুসুবি বোনতাম। যা হবে আপনার আৰ্দ্ধেক, আমাব আৰ্দ্ধেক।

—বেশ নিয়ে যাও—

তারপর শুনলাম মুসুরি বুনবাব টাকা দিয়ে বাবিক ওব গানের দলেব ডুগি-তবলা কিনেচে।

একদিন বললাম—মুসুবি বুনলে বাবিক ?

—আজ্ঞে বাবু।

—ক' বিঘে ?

—এক বিঘে।

—আর দু বিঘে ?

—বাবু, আর দু'টো টাকা দিতি হবে। খরচে কুলোচ্চে না।

—মিথ্যে কথা। তুমি তোমাব গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচ সেই পয়সা দিয়ে। কোথায় তোমাব গানের দল ?

—ওই জেলেপাড়াব জেলে ছোঁড়াদেব নিয়ে বসি। রোজ আঁখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালবাসি বাবু। এবার পূজোব সময় 'সাবন সমর' বা 'অজামিলেব বৈকুণ্ঠ লাভ' নামাবো বারোয়ারীর আসরে—দেখি যদি খোদার মর্জ্জি হয়—আমার ছোট ছেলে কেষ্ট সাজে, দ্যাখবেন কি গানের গলা—কি এ্যাক্‌টো—

—বেশ, বেশ—

—দ্যান বাবু দু'টো টাকা।

—নিয়ে যাও, কিন্তু মুসুরি ঠিক বুনবে।

—তা আর বল্‌তি ? কাল সকালেই বাকি দু'বিঘে সাঙ্গ করবো।

ধানের সময় আমার ভাগে যে ধান দেওয়ার কথা, বারিক আমাকে তা দিলে

না। অনেক কম দিলে। লোকে বল্লে বাবু, ও ওই রকম। কত লোককে ফাঁকি দিয়েচে, আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে ফাঁকি তো দেবেই। খুব রেগে বারিকের বাড়ি গেলাম।

গিয়ে দেখে-শুনে বেশি রাগ রইল না। কি মুস্কিল, এই রকম বাড়িঘর ওর! মাত্র একখানা চারচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানালার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো, দোর পর্য্যন্ত নেই ঘরের। ওর দলিজে বিছানো আছে একখানা বেদে চটা অর্থাৎ খেজুর পাতার বোনা পাটি, একটা কলঙ্ক ধরা তামার বদনা, একটা হুঁকো আর তামাক, টিকে রাখবার মাটির পাত্র। একখানা অত্যন্ত ছেঁড়া ও ময়লা রাঙা নরুণ পাড় শাড়ী চালে শুকুচ্চে। চালেব অন্যস্থানে একটা কুমড়ো গাছ উঠেছে। উঠোনে একখানা ভাঙা গরুর গাড়ী। সবসুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রাখতে গেলে ভাব-প্রবণ হোলে চলে না। আমি কড়া সুরে বল্লাম, মোটে দু'বিশ ধান পেলাম তিন বিঘে জমিতে? আমার সবসুদ্ধ বাইশ তেইশ টাকা নিয়ে এসেচ, তার বদলে ধান দাও। আর বছরেব ভিটের খাজনা দু'টাকা তাও শোধ করো। নইলে কালই নালিশ ঠুকে দেবো।

বারিকের দুটি ছেলে, বড়টির বয়স আঠারো-উনিশ, ছোটটির চোদ্দ পনেরো। তারা বাবার কাছেই দলিজে বসে গল্পগুজব করছিল। চট করে একখানা খুরসি পিঁড়ি এনে বড ছেলেটা আমায় বসতে দিলে।

বারিক বল্লে—যা, কাঁটালপাতা কি কলার পাতা নিয়ে আয় বাবু তামাক খাবেন। ওরে আলি, শীগ্‌গির ছোট্।

—থাক আমার তামাকের দরকার নেই। ধান বের করো বাকী টাকার—

—ঠাণ্ডা হোন বাবু। তামুক খান আগে—

বারিক নিজে তামাক সেজে দিলে।

বল্লাম—তোমার ছেলেরা কি করে?

—বড়টি গরু চরায়। ওরা দু'জনে ভালো গান গায়। শুনিয়ে দে বাবুকে একখানা গান।

—থাক, গান এখন দরকার নেই, তুমি ধান বের করো।

—দেবো, বাবু দেবো।

—আর খাজনা? আজ সব শোধ করে দিতে হবে। নইলে নালিশ হবে জান?

—দেবো বাবু, দেবো, তামাক খান।

একটু পরে বারিক ও তার দুই ছেলেতে ধরাধরি করে দুবস্তা ধান বার করে নিয়ে এল। বারিক বল্লে, বাবুর এই ধান গুলো ওঁর বাড়ী পৌছে দিয়ে আসতি হবে—গরু দু'টো খুঁজে নিয়ে এসে গাড়ী জুতে দে।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—কত ধান?

—আড়াই বিশ।

—সাড়ে সাত মণ? এতে তো শোধ হবে না দেনা।

—বাবু, আল্লার কিরে, ঘরে আব ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেবে। আর কিছু নেই, আপনি দেখে আসুন ঘবে।

—তোমার ধান রইল না?

—না বাবু। সব দেলাম—

—তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে খাবে কি?

—তা' আর কি করবো বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় কবি।

ওব কথা আমার বিশ্বাস হোল না।

দুই বস্তা ধান গরুর গাড়ি করে ওরা আমাব বাড়ী পৌছে দিলে।

দু'দিন পরে বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে দেখি কোথায় যাচ্ছে। বারিকেব বগলে বেহালা।

বল্লাম, ও বারিক, কোথায় চল্লে?

—আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি।

—তুমি কি বেহালা বাজাও ?

—ওই অমনি একটু একটু। খোদার মর্জ্জিতে।

জেলেপাড়ায় ওদের দলের ঘরে একদিন গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হোলাম। বাঁওড়ের ধারে একটা জাম গাছের ছায়ায় লম্বা দোচালা ঘর, কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল, বসবার জন্যে খান চারেক পুরনো মাদুর, এক কোণে দু'জোড়া ডুগি-তবলা, একখানা খোল, এক জোড়া মন্দিরা, গোটা দুই থেলো হুঁকো টাঙ্গানো বাঁশের খুঁটির গায়ে। জন-পাঁচ-ছয় লোক জুটেচে, বাকি এখনও আসে নি। আমাকে ওরা সরবে অভ্যর্থনা জানালে। বটতলাতে বসলাম। সামনে বাঁওড়ের স্বচ্ছ জলে পদ্মফুল ফুটে আছে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি বালি মাটির পথ গিয়ে জলের ঘাটে নেমেচে, পানকৌড়ি বসে আছে পাটা-শেওলার দামে। ওপারে কাজি সাহেবের দরগা, ভাঙ্গা পাঁচীলে মস্তবড় জিউলি গাছ বেড়ে উঠে সমস্ত দরগা ঘরের ওপর ঝুপসি ছায়া পড়ে আছে, আঠা ঝরে পড়চে গাছটার কাঁধ থেকে—খানিকটা সাদা, খানিকটা লাল—আঠা ঝরে ঝরে দরগা ঘরের পশ্চিম দিকের পাঁচীলের কোণটা একেবারে ঢেকে গিয়েচে। দরগাতলার ঘাটে ওপারে আমিনপুর গ্রামের কৃষক-বধূরা মাটির কলসী কাঁকে জল নিতে যাওয়া-আসা করচে!

একজন তামাক সেজে কলকে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—তামুক সেবা করুন—একটা কলার ডাঁটা কি এনে দেবো ?

আমি তামাক খেতে খেতে বল্লাম— তা' একটু গান-বাজনা হোক, শুনি।

সে বল্লে, বারিক এখনো আসেনি। সে না এলে আরম্ভ হবে না বাবু। সে হোল বেয়ালাদার। এ দলই তার। এর নাম বারিক অপেরা পার্টি।

—বাঃ বাঃ নাম দিয়েচে কে ?

—বাবু, মোরা তো ইংরিজী জানিনে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে, তাই দেখে মোরা একটা মিল খাটিয়ে করিচি! ভাল হয় নি ?

একটু পরে বারিক এসেও সেই কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বল্লাম—নামের মত নাম একটা হ'য়েচে বটে। খাসা নাম।

—গান শুনিয়ে দে, বাবুরি তামুক সেজে দে।

ব্যস্তসমস্ত বারিককে ঠাণ্ডা করে আমি তাকে বেহালা বাজাতে বল্লাম। ওর দুই ছেলে বেশ গান গায়। ছোট ছেলে কৃষ্ণ সাজে, বেশ কালো নধর চেহারাটি। তাকে বারিক বল্লে গান করে আমায় শুনিয়ে দিতে। সে রগে হাত দিয়ে তারস্বরে শোনাই যাত্রার এক গান আরম্ভ করলে :—

ওরে ও কিছান ভাই,
আমি হেথা বলে যাই
গওরেতে শোন সেই বাণী—

বল্লাম—বেশ, বেশ। কৃষ্ণের গান ?

বারিক ধমক দিয়ে বল্লে—মানভঞ্জন পালার সেই গানখানা গা—আমার সঙ্গে ধর।

বলে নিজেই রগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে।

ধনি, কি সুখে রাখিব পরাণ,
কানু হেন গুণনিধি, গ্রেহে না আইল যদি
অঝোরে বহিল দু'লয়ান—
(ও) লয়ান যে বহে যায়
গুণমনির বিরহ জ্বালায়
লয়ান যে বহে যায়—

বারিক গান করে মন্দ নয়। খানিকক্ষণ থেকে আমি চলে এলাম। জ্যোস্নারাত ছিল। বারিক কি আসতে দেয়?—বসুন বসুন। চন্দ্রাবলীর গান একটা শুনে যান না? আমি নিজে শিখিয়েছি।

রাত এগারোটার সময় দেখি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বারিক বাড়ি ফিরচে বন-জঙ্গলের পথ দিয়ে। বারিকের বাড়ী চালদী গ্রামে, ওদের যেখানে বাঁওড়ের ধারে গান-বাজনা হয়, বারিকের বাড়ী থেকে সে জায়গা দেড় মাইলের ওপর। এই পথের অধিকাংশই ঘন বন-জঙ্গলে ভরা, সাপখোপের ভয় তো নিশ্চয় আছে এত রাত্রে।

বারিককে ডেকে বল্লাম—আলো নিয়ে যাওনা কেন বারিক ?

বারিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বল্লে—কে, বাবু? এখনো জাগন্ত আছেন? আর বাবু আলো! কেরোসিন তেল কনে পাবো? কেরোসিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্চে রোজ রোজ। গান কেমন শোনলেন? আগাগোড়া নিজে শিখানো বাবু। ওরা সব জেলে মালো, বেতালা বেসুরে গান গাইতো। হাতে-নাতে শেখালাম বাবু—

বারিক এমন ভাব প্রকাশ করলে যেন সে স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ।

আমি তাকে এক আঁটি পাকাটি দিয়ে মশাল জ্বেলে নিয়ে বাড়ি যেতে বল্লাম।

হাটে ওদের গ্রামের সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা—যে সোনাই মণ্ডল তার ধানের জমি আমার কাছে বিক্রি করেছিল। বেগুন বিক্রি করছে দেখে বল্লাম —সোনা ভাল আছ ?

—আজ্ঞে হাঁ একরকম বাবু।

—বেগুন দ্যাও দু'সের।

—বাবু, একটা কথা আপনাকে বলতাম। বারিকের অবস্থা যে খুব খারাপ হোল, আপনি মনিব, আপনাকে না বল্লি আর কাকে বলি।

ভাবলাম, বারিকের বোধ হয় খুব অসুখ হয়েচে। কিন্তু দু'চারদিন আগে তাকে গান করে বাড়ি ফিরতে দেখলাম যে। কি হয়েচে তার ?

সোনাই বল্লে, তা না বাবু। ওর বড় দুর্দ্দশা হয়েচে। আপনার কাছে এক মুঠো টাকা দেনা ছিল। আপনি ধানগুলো নিয়ে গেলেন। আর ঘরে খোরাকীর ধান রইল না। যার কাছে নেবে, তা আর ফেরৎ দেবে না এই ওর দোষ। নলে নাপিতের আর রামচরণ ময়রার গোলা থেকে আর বছর সমানে ধান কর্জ্জ নিয়েচে, একটি দানা শোধ করেনি। সেদিন নালিশ ক'রে রামচরণ ময়রা ওর বলদ ক্রোক দিয়ে নিয়ে গিয়েচে গত সোমবারে। ধান কর্জ্জ পাচ্চে না কারো কাছে, একবেলা খেতে পাচ্চে একবেলা খাওয়া জোটচে না। বস্তর আবানে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই। ছেলে দুটো আহমদ দফাদারের বাড়ি ওবেলা দুটো ভাত খেয়েছে। স্বামী ইস্তিরির বোধ হয় খাওয়াও হয় নি আজ।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—সে কি কথা। গত সোমবারে ওর গরু ক্রোক হয়েছে বলছো, সেই সোমবার সন্দের সময়েই যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহা আনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখিচি?

—তা গ্যাখবেন বাবু। ও যে ওই রকম লোক। কাল কি খাবে সে ভাবনা নেই—দেখুন গিয়ে দুই ছেলে নিয়ে বেহালা বাজাচ্চে—

—ধান নেই ঘরে?

—এক দানা নেই বাবু।

—ওর মহাজনের কাছে কর্জ্জ করে না কেন?

—ওই যে বল্লাম বাবু, সে দিকি যাবার যো আছে? মহাজনের ঘরে সতেরো শলি ধান কর্জ্জ নিয়েছিল, তার এক খুঁচি ধান শোধ করে নি। দেনায় মাথার চুল বিক্রি। যার নেবে তারে আর দেবে না। কথার একদম ঠিক নেই। কেউ বিশ্বেস করে আর দেয় না।

এর কিছুদিন পরে বারিক আমার কাছ থেকে দশটা টাকা ধার নিয়ে গেল। কলাই বেচে টাকা শোধ করবে এই সর্ত্তে তাকে টাকা দিলাম। ক্ষেতের কলাই, মুগ সব যে যার বিক্রী করে ফেললে, বারিক আমার সঙ্গে আর দেখাও করলে না। একদিন হাটে খবর পেলাম বারিকের কলাই, মুগ আহমদ দফাদার সব কিনে নিয়েচে। শুনে আমার ভয়ানক রাগ হোল। বারিকের বাড়ী পরের দিন সকালেই গেলাম। বারিকের প্রতিবেশী তোফাজ্জেল বল্লে—বাবু, শিগগির যান, সে এখনো তার দলিজে বসে তামুক খাচ্চে, আপনি যাচ্চেন শুনলি পেলিয়ে যেতে পারে। পাওনাদার এলেই পালাবে। ওর স্বভাবই ওই।

বারিকের ঘরদোরের অবস্থা আরও ছন্নছাড়া, চালের খড় গত বর্ষায় পচে ঝুলে পড়েচে, উঠোনের মাঝখানে মুগ কলাই মাড়বার খামার, এক পাশে ভূষি স্তূপাকার হয়ে আছে! গাড়ি-গরু নেই উঠোনে।

বারিক আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। মুখ ওর শুকিয়ে গেল।

—আসুন, বাবু, সালাম। দলিজে ওঠে বসুন। ওরে আলি, খুরসী পিঁড়িখানা বাবুরি পেতে দে—

—থাক গে পিঁড়ি। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে। মুগ কলাই বিক্রি হয়েচে ?

—হ্যাঁ বাবু।

—আমার টাকা দাও—

—ট্যাকা এখনো মোর হাতে আসেনি বাবু।

—মিথ্যে কথা। কার কাছে বিক্রি করেচো ? আহমদ দফাদারের কাছে তো ? সে সংবাদ আমি রাখি। আহমদ কারো পয়সা বাকী রাখবার লোক নয়। টাকা বের করো—

বারিক নির্ব্বিকার ভাবে আমার জন্যে তামাক সাজতে লাগলো। তামাক সাজা শেষ করে আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিযে বল্লে, তামুক সেবন করুন—

—আমার কথার উত্তর দাও।

—আপনি নেয্য বলেচেন। টাকা ওরা দিইছিল, তা সংসারের জ্বালা, সে টাকা মোর খরচ হয়ে গিয়েছে। তবলা ছাইতে খরচ হোল তিন টাকা। বেহালার তার এনেলাম মুকুন্দ তেলির দোকান থেকে।

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনে। খেতে পাওনা, মহাজনের দেনা শোধ করবার যখন ক্ষমতা নেই, তখন অত সখ কেন ? বাড়িঘরের তো এই অবস্থা। গাড়ি-গরু কি হোল ?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ওর প্রতিবেশীদের মধ্যে কে একজন। আমার চড়া সুর শুনে অনেকে জড়ো হয়েছিল ওর ঘরের সামনে। বল্লে—ওরে আর কিছু বলবেন না বাবু। লোকটার আর কিছু নেই—

—গাড়িগরু কি হোল ?

—রামচরণ ময়রা গরু ক্রোক দিয়ে নিয়ে গেল, গাড়িও বিক্রি করে ফেলচে আহমদ দফাদারের কাছে। গাড়ি গরু না থাকলে চাষার উঠোন মানায় ? বলি ও চাচা, বাবুর কাছ থেকে টাকা আনলে কেন, যদি শোধ করতে পারবা না ? ভদ্দর লোকের কাছে কথা ভাও কেন তুমি ? একেবারে দশায় ধরেচে তোমায়—ছ্যাঃ—জুয়োচুরি করা কেন ?

বারিক মুখ চুন করে বসে রইল, আর সকলের হাতে হাতে কলকে পরিবেশন করতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে চলে এলাম। বারিক কোনো কথা গায়ে মাখে না, কে যেন কাকে বলচে।

বারিকের বাড়ি কিছুদিন আর গেলাম না। টাকা আদায় হবেনা জানি, ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। টাকা কড়ির সম্পর্ক ত নয়ই।

বারিকের সঙ্গে মাস দুই পরে একদিন হাটে হঠাৎ দেখা। কাঁধে একখানা ময়লা গামছা, পরণে ছেঁড়া আধময়লা ধুতি লুঙির মত করে পরা। সদা হাস্যমুখ বারিক আমাকে দেখে বল্লে—বাবু, সালাম। আমাদের ওদিকে আর যান না?

—না। আমার অন্য কাজ আছে।

—আজ একবার মহল্লাঘরে যাবেন বাবু ও বেলা? দুটো গান শোনাতাম আর দেখতেন আমাদের সাধন সমর পালাটা কি রকম হোল। আজ পুরো মহল্লা হবে। পরশু গান হবে আরামডাঙ্গায় বিশ্বেসদের বাড়ি।

—আমার সময় হবে না।

—ও কথা বল্লি বাবু শুনচি নে। আসুন দয়া করে। আপনারে গান শোনাতে বড্ড ভাল লাগে। যাবেন বাবু।

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সন্ধ্যার কিছু আগেই বাঁওড়ের ধারে ওদের বারিক অপেরা পার্টির মহলা ঘরে গিয়ে বসলাম। বারিক ও তার দুই ছেলে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এল। তখন বাঁওড়ের দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়ায় বড্ড শীত করচে, সময়টা মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। বারিকের গায়ে একখানা বহু পুরনো কুষ্টিয়ার চাদর। জোৎস্না রাত্রি। আমি বাইরেই বসে রইলাম। বারিক মহাব্যস্ত অবস্থায় কখনো গান করে, কখনো এর গানের ভুল ধরে, ওর তালের ভুল ধরে, হাসি ঠাট্টা ও অঙ্গভঙ্গি কি ভাবে করতে হবে বিদূষকের ভূমিকায় তা শিক্ষা দেয়, ছেলেকে শিখিয়ে দেয় কৃষ্ণের ভূমিকায় কি রকম বেঁকে দাঁড়াতে হবে, এর দোষ ধরে, ওর গুণ গায়—মোট কথা এই বয়সে তার উৎসাহ, আমোদ, লম্ফঝম্প একটা দেখবার জিনিষ।

আবার বাইরে এসে আমার কাছে বলে বাবু বিড়ি খান একটা। ছাখচেন

কেমন? আমার নামে যখন এ দল, তখন বারিক অপেরা-পার্টির যাতে বাইরে নাম ভালো হয়, তা আমাকেই দেখতে হবে না কি বাবু! অজামিল ক্যামোন দেখলেন! চলবে? কেষ্ট? বেশ। আপনারা ভালো বল্লিই ভালো।

কে বলবে এই সেই বারিক, যার দু'বেলা খাওয়া হয় না যার গাড়ি-গরু পর্য্যন্ত মহাজন ক্রোক দিয়েচে, দেনায় যার মাথার চুল বিক্রি, যার বয়েস পঞ্চান্নর কোঠা ছাড়াতে চলছে। এই মহল্লার ও একাই এক'শ।

পরদিনই হাটে আহমদ দফাদার ওকে কি করে অপমান করলে আমার সামনে। চেঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখলাম, আহমদ ওর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করচে। আহমদ চালদীগ্রামের অবস্থাপন্ন লোক, লম্বা দাড়ি রাখে, বেশ একটু গর্ব্বিত, ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। এবার ধানের দাম সাড়ে ষোল টাকা পর্য্যন্ত মণ দর উঠেছিল, দু'টি গোলা ভর্ত্তি প্রায় হাজার মণ ধান চড়া দরে বিক্রি করে আহমদ টিনের বাড়ী ঘুচিয়ে দোতলা কোঠা বাড়ী করেছে।

আমি গিয়ে বল্লাম—কি করো আহমদ? ওকে ছেড়ে দাও, ছিঃ তোমার চেয়ে বয়েসে কত বড না?

আহমদ হাতে পয়সা করেচে, কাউকে মানে না। আমার দিকে ফিরে বল্লে—আজ জুতিয়ে ওর ইয়ে দেখিয়ে দেবো বাবু, এত বড় আস্পদ্দা, আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কথা বলে। মুগ দেবো বলে বায়নার টাকা নিয়েচে সেই আর বছর। দু'মণ কলাই দিয়ে আর টাকাও দেয় না, কলাইও দেয় না। রোজ বলে দিচ্ছি দেবো, আজ আমি ওরে—আমার সঙ্গে কিনা ঠকামি কথা বলে বাবু? এত বড় ওর সাহস? (যেন সাক্ষাৎ ভাইসরয় কিংবা মহাত্মা গান্ধী কিংবা গৌর গোপাল ভক্তিবিনোদ গোস্বামী কিংবা বশিষ্ঠ মুনি কিংবা জুলু সর্দ্দার লোচবঙ্গুলা)।

বারিক তখন বলচে—ছেড়ে দ্যান বাবু, আমি ও মুমুন্দিকে একবার দেখে নেতাম! আপনি ধরলেন কেন?

আহমদ আবার সবেগে ঠেলে উঠে বল্লে—তবেরে—

আবার তাকে কোনরকমে ঠাণ্ডা করি।

আহমদকে বল্লাম—কতটাকা পাবে ?

—তা বাবু অনেক। খেতে পায় না, দু'বিশ ধান দেলাম আশ্বিন মাসে। সাতাশ টাকা নিলে মুগের দাম, মোটে দু'মণ কলাই দিলে, এখনো পনেরো টাকা তার দরুণ বাকি। ঝিঙের ভুঁই করে গাঙের ধারে, তার দু'বছরের খাজনা সাড়ে চার টাকা। আমার গাছ থেকে ব্যবসা করবে বলে দেড় কুড়ি নারিকেল পেড়ে আনে, তার দরুণ একটা পয়সা দেয়নি—ওর মত মিথ্যেবাদী, ফেরেব্‌বাজ জুয়োচোর এ দিগচর পাবেন না—আপনিও তো শুনতে পাইবেন—এক মুঠো টাকা—

বারিকের প্রতিবেশী সোনাই মণ্ডল আমাকে আড়ালে বল্লে—বাবু, দু'কাঠা মুসুরী আর দু'টো মানকচু বেচতি এনলে বারিক তা সব আহমদ কেড়ে নিয়েচে। হাটে ওই বেচে চাল কিনে নিয়ে যাবে তবে ওদের খাওয়া হোত। কি অন্যাই কাণ্ড দেখুন দিকি ? ছ'আনা পয়সা হবে আপনার কাছে ? বেগুন পটলটা ওকে কিনে দি—

সেই দিনই রাত প্রায় দশটার সময় শুনলাম বারিক উচ্চৈস্বরে রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে বারিক অপেরা পার্টির মহল্লা দিয়ে ফিরচে :—

"তুমি কোন্ অংশে বল কোন বংশে
কারে-এ-এ করেচ সুখী—
নামটি তোমার দয়াময়
কথায় বটে কাজে নয়"—ইত্যাদি

এরপরে অনেক দিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি।

একদিন সোনাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা। তাকে বলি—বারিক কেমন আছে।

—আর বাবু! আপনি শোনেন নি। তার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েচে!

—কি-কি-কি ব্যাপার ? কি হোল ?

—ওর সেই বড় ছেলেটা আজ সাতদিন হ'বে মরে গিয়েচে।

—সে কি কথা ? কি হয়েছিল ?

—বাবু, পুরনো জ্বরে ভুগছিল। পেটে পিলে। রোজ সন্ধেবেলা জ্বর হোত। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই। জ্বর সেরে গেল তো·পান্তা ভাত আর পটল পেঁজ-পোড়া খেলে! সেদিন রাত্তিরে জ্বর হয়েচে ওর সেই অপেরা পার্টি থেকে গান সেরে এসে। ভোর বেলা মারা গেল। কাফনের কাপড জোটে না শেষে, এই তো অবস্থা। বুড়ো বয়েসে ওই ছেলেডা তবুও মাথাধরা হয়ে ঠেলে উঠছিল। আর একটা ছেলে, সে তো বাচ্চা, তার ভরসা কি?

অত্যন্ত মর্ম্মাহত হোলাম বলা বাহুল্য। মনের কোণে ঘোর মিথ্যেবাদী, জুয়োচোর, সদা প্রফুল্ল, বৃদ্ধ বারিকের প্রতি একটু অনুকম্পার ভাব সঞ্চিত ছিল। কাল সকালে একবার বারিকের বাড়ি যাবো। ভাগের জমি দু'বছর কেড়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে এবার ওর সঙ্গেই আবার বন্দোবস্ত করবো। পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত।

সেই দিনই রাত দশটা এগারোটা। গোঁসাই বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে যেতে যেতে শুনি কোথা থেকে বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব ভেসে আসচে। নিমচাঁদ গারই বল্লে—বাবু, গোঁসাই বাড়ীর নাট মন্দিরে আজ জন্মাষ্টমীর দিন বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্চে। বেশ ভাল পালা হবে, গিয়ে শুনুন।

আসরে গিয়ে দেখি বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে। পালা হচ্চে 'সাধন সমব' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

উড়ুম্বর

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দ্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ি আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত'খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে? গাছেব তলায় বসেছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে বকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু চোখের পাতা কাল বুজুতে পারিনি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খাবাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়েনি আজ দশ পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন —বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক্ দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে, নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্ম্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প প্রসবের সময় হয়নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে না কি? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্য রকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'এর নাকি বাঙ্ময় আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখান হচ্চে? এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেচে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্ত্যে গিয়ে দেখে আসব। দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না?

—নিশ্চয়ই যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চ্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্ব্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে এখনো আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা ত সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময় আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে?

—আজকাল বাঙ্ময় আলেখ্যের যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্য্যন্ত দুটি বাঙ্ময় আলেখ্যের প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তারও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত বক্ষদেশাবলম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্ত্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্ব্বাচার্য্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে, যাবো।

—এখন মর্ত্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুইজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুর ঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্ত্য-ধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্ত্যধামের সৌখীন লীলা-বিলাসেব বাসনা এখনও তাহাব যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত স্বরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু, এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আব কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তবে তো আমাদের আশাই নেই। আপনাবা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্য-পাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখচি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য। এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন, কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা, তুমি থাম তো। তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে!

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখচি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময় আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত'খানার ওই রকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী মাধবে'র? সেইজন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও করে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময় আলেখ্য নির্ম্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্ত্যধামে আর কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় অসার কথা বলো ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোটল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন? আমরা হোলাম

কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাংলা—সোঢল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙ্ময় আলেখ্য নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য ?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পূ কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিংবা কালিদাস দাদার—

—থাক্, আমার কথা বাদ দাও—ওঁদের কথা বলতে পাবো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থা। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন ? আলেখ্য দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্ম্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে এক সঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন ? এক সঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক ? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি ?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্ছি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙ্ময় আলেখ্য দর্শনে মর্ত্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ্য পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল শাদা হইলেও কুঞ্চিত, পরিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকার পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ সৌখীন ধরণের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকে।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্ত্যধামে ঘুর ঘুর করে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান করে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙ্ময়-আলেখ্য-প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না আপনার ভ্রম হয়েচে। ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের ক্বাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ করে দেখছিলাম—মর্ত্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙ্ময় আলেখ্য। মর্ত্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙ্ময় আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাইনে। আর কথায় কথায় গীত। নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাইনি দাদা। কালিদাস দাদাই

আমাকে বল্লেন, উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমিই ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চল্লাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতা 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভিড় খুব। ডিম ভাজা ও ঘুঘ্‌নি, চানাচুর বাদাম ভাজা, আলু-কাবলীওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি? এ কার মেঘদূত? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাইতো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এ এখানে বসে দেখে কি করবো বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি?

—আজ্ঞে না· চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—মেঘদূত কার লেখা বই হে?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল'?

—তা জানিনে। বই উঠেচে জানিস?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কি না।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা

দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনচেন এ অর্ব্বাচীন বালক দুটি কি বলচে? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বাঙ্ময় আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি?

সুবন্ধু বলিলেন—এই বাঙ্ময় আলেখ্যের নির্ম্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওবা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্ত্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ।

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ করে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বাঙ্ময় আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করেনি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে—আপনাদের কি?

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ?

ব্যাসদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল? ভাস, তুমি ভাল আছ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে? মর্ত্ত্যধামে? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময় আলেখ্য নির্ম্মাণ করিয়ে দিতে পারো? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো কালকার ছেলে, মর্ত্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময় আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বল্লে? মেঘদূত? কি অবলম্বনে লেখা? কাব্যের ঘটনাটি কি?

কালিদাস লজ্জিত স্বরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনা মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝো ব্যাপার।

মাছ চুরি

সকালবেলা।

টুরু ও সন্তু তেঁতুলগাছে পা ঝুলিয়ে টক্ টক্ তেঁতুল পাতা চিবুচ্ছে। টুরু বল্লে—সন্তু, ওবেলা আমার সঙ্গে তেঁতুলতলার দোয়াতে যাবি তো ?

—ঠিক যাবো। আর কাউকে বলিস নে।

—বলতেই হবে হাবুকে। দুজনার কাজ নয়, বড্ড সোঁত। ডুবিয়ে দিয়ে যাবে।

—যদি টের পায় ?

—বেশি রাত্তিরে যেতে হবে।. জ্যোচ্ছনা-রাত্তিব, তিনজনে ভয় কি ?

—ভূতের ভয়, বা-রে! আবার পাশেই চটকাতলার শ্মশান !

—দূর, ভূতটুত বাদ দে। তিন ব্রাহ্মণে আবার ভূতের ভয় ?

বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। নদীতে ঢল নেমেছে; তবতর বেগে স্রোত বইছে, কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যায়। তেঁতুলতলার দোয়া গ্রামেব উত্তরে, তার পারে সাঁইবাবলা আর কুঁচঝোপের জঙ্গল, নদীর এই বাঁকে নদীব গভীবতা খুব বেশী, তাই এর নাম তেঁতুলতলার দ'। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে মড়া বেধে থাকে ডাঙার জঙ্গলের ছায়ায়, কামট ·আর কচ্ছপে মড়া ছেঁড়াছেঁড়ি করে, ভয়ে এদিকে দিনমানেই কেউ আসতে চায় না, চিংড়িমাছধরা নৌকাগুলো দোয়াড়ি ঝাড়বার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা পর্য্যন্ত করে না।

সন্ধ্যা পার হয়েও প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হোল।

কুঁচগাছে জোনাকির ঝাঁক জলচে নিবচে।

ওরা তিনটি ছেলে সন্তর্পণে চলেচে তেঁতুলতলার দ'য়ের পথে। সন্তর্পণে যাওয়ার বিশেষ কারণ আছে। এ বর্ষায় বিষাক্ত সাপেরও ভয়, বাঘেরও ভয়; হাতে ওদের দা, লাঠি, শক্ত দড়ি। কিন্তু কোন আলো নেই, কাজে যাচ্ছে, আলো থাকলে লোকে টের পেয়ে যাবে।

সন্তু বল্লে—ভয় করবে না তো তোদের? পাশেই শ্মশান, ডাকসাইটে ভূতের জায়গা তেঁতুলতলার দোয়া।

টুকু ও হাবু হেসে উঠলো। ভয় করলে ওরা এ কাজে আসতো না!

টুকু বল্লে—ভূতটুত রাখ এখন, গদাই জেলে কোথায় মাছটা বেঁধে রেখেচে জানিস তো?

সন্তু ওদের মধ্যে মাছ ধরা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সে বল্লে, জেলেরা ডাঙায় কোন বড় গাছের গুঁড়িতে কাছি বেঁধে জলে নামিয়ে দেয়, সেই কাছির সঙ্গে মাছ বেঁধে রাখে।

ঐ দূরে তেঁতুলতলার দোয়া দেখা যাচ্ছে। মন আনন্দে নেচে উঠলো ওদের। এবার অত বড় মাছটা ওদের হাতের মুঠোয়!

সন্তু বল্লে—আমাদের টেনে আনলি তো, মাছ যদি না থাকে?

টুকু খোঁজ না নিয়ে এখানে আসে নি। সে জানে গদাই জেলে আজ সকালে মস্ত একটা দশ-বারো সের রুইমাছ ধরে তেঁতুলতলার দোয়ার গভীর জলে জিইয়ে রেখে এসেচে, কারণ আজ হাট বার নয়, অত বড় মাছটা বিক্রি করার সুবিধে হবে না। দিলে নেবে না কি, সবাই নেবে এখন। গাঁয়ের বামুনপাড়ায় সবাই নেবে এখন ধারে, তারপর তাগাদা দিতে দিতে পয়সা আদায় যে কোনকালে হবে, তার কোনো ঠিক নেই। না দিলে রাগ। জেলেপাড়ার সবাই বামুনদের ভিটের প্রজা। 'উঠে যাও, চাইনে তোমার মত প্রজা ইত্যাদি': তার চেয়ে হাটে মাছটা নিয়ে গিয়ে নগদ দামে কলকাতার ব্যবসায়ীদের বিক্রি করো,—নির্ঝঞ্ঝাট।

এই সব ভেবেই গদাই মাছটি জিইয়ে রেখে এসেছিল তেঁতুলতলার দোয়াতে।

টুকু তা টের পেয়েচে আজ সকালে। সে গুড় কিনতে গিয়েছিল গদাই জেলেরই বাড়ী। গদাই আখের গুড়ের ব্যবসা করে এবং বাকি সময় দশ আনা সের খুচরো বিক্রি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে। টুকু ওদের উঠোনে গিয়ে গুড়ের বাটি হাতে দাঁড়াতেই শুনলে গদাই ঘর থেকে বলচে, 'মাছটা কি বড় রে! দশ

সেবের কম হবে না। জিইয়ে রেখে দিয়ে এ্যালাম তেঁতুলতলার দোয়াতে। গাঁয়ে সবাই ধার নেবে, পয়সাব তাগাদা দিতে দিতে পায়ের জুতো ছিঁড়ে যাবে, তবু আদায় হবে না। কাল হাট আছে, কাল তুলে নিয়ে আসবো।'

সন্তু বল্লে—এখন খুঁজে পেলে হয়, জ্যোচ্ছনা তো উঠলো।

তেঁতুলতলার দোযার ধাবে ওবা পৌঁছে গিয়েচে।

আলো আঁধারের জাল বুনেচে নদীর পাবেব বনে বাদাড়ে। মেঘভাঙা চাঁদের আলো পড়েচে বড বড় বনকচু আর ছোট গোয়ালের পাতাব গাযে। ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ বার হচ্চে বর্ষাসন্ধ্যায়। নদীজলে কেমন এক ধবনেব শব্দ হচ্চে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে বনের অন্ধকার গহনে।

সন্তু ভয়ের সুরে বলে উঠলো—ফেউ ডাকচে চটকাতলাব ওদিকে—ওই—

টুকু বল্লে—দূর, ও ফেউ নয, এমনি শেয়াল ডাকচে।

—কে জলে নামবে?

—আমি নিজে নামবো। দাঁড়া দেখি কোন্ গাছে দড়ি বেধেচে।

টুকু কথা শেষ করেই ডাঙাব ধাবের সব গাছ খুজতে লাগলো। ওবা সবাই খুজতে লাগলো। অন্ধকার এখনো চাঁদেব আলোতে ভালো করে দূর হয় নি, এ সব জায়গাতে অন্ধকার কোনদিনই বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে যায় না। নাঃ, কাছি বাঁধা নেই কোন গাছেই।

সন্তু বল্লে—টুকুর যত বাজে কথা—

টুকু রাগের সুরে বল্লে—বাজে কথা তো বাজে কথা। তুমি এলে কেন ভাই? আমার কথায় যদি তোমার এত অবিশ্বাস—

—তবে মাছটা কি জলে ছেড়ে দিযে গেল? দড়ি কোথায? বেঁধেছে কিসে? চল বাড়ি যাই—আব এত বাতে ভূতেব জায়গায় থাকে না।

হঠাৎ টুকু চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউবেকা, ইউবেকা'।

—তার মানে?

—তার মানে পেয়েছি, পেয়েছি! পড়িস নি নীতিসুধার সেই গল্পটা? আর্কিমিডিস্ বলে একজন সাহেব পণ্ডিত কি একটা বার করে চেঁচিয়ে

উঠেছিলেন ? গদাই চালাক লোক, কাছি গাছের সঙ্গে বাঁধে নি রে। জলের মধ্যে খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে কাছি বেঁধেছে—ঠিক একেবারে—নির্ঘাৎ—

সত্যিই তাই। খুঁজতেই পাওয়া গেল বটে। জলের ধারে মোটা বাবলা-কাঠের গোঁজ। টুরুকে মিথ্যেবাদী বলাতে ওর রাগ হয়েছে। সে বল্লে—এই ছাখ্ গোঁজ—এর সোজা জলের মধ্যে বড় খোঁটা পুঁতে তাতে মাছ বেঁধেচে। আমি জলে নামবো। তোরা এখানে থাক দাঁড়িয়ে—

সন্তু মাছের ব্যাপার অনেক কিছু জানে। সে নিজে ভাল বর্শেল, অর্থাৎ ভাল মাছ ধরিয়ে। সে পরামর্শ দিলে সবাই মিলে জলে না নামলে অতবড় মাছ কিছুতেই ডাঙায় তোলা যাবে না। অন্তত ছ'হাত জল থেকে মাছ ডাঙায় তুলতে হবে। গোঁজ পুঁতেচে চিনে ঠিক করবার জন্যে। ঠিক ওই সোজা জলে নামতে হবে।

সবাই মিলে জলে নামলো। খরস্রোতা নদী, তীরের মত একরোকা গতিতে ভাঁটার দিকে ছুটেছে।

সন্তু বল্লে—সাবধান, যদি বেকায়দায় সোতে পড়ে যাও, তবে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলবে একেবারে আঠারো-বাঁকির চরে, জ্যান্ত কি মড়া তার ঠিক নেই।

খুঁজতে খুঁজতে একগলা জলের মধ্যে সত্যিই প্রকাণ্ড বাঁশের খোঁটা পাওয়া গেল। তাতে কাছি বাঁধা। কাছিতে সন্তুর পা ঠেকতেই হাত দশ-বারো দূরে জল ঘুলিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা জলের জীব হুড়ুম করে ভেসে উঠলো!

সন্তু চমকে উঠে বল্লে—কি ওটা ?

হাবু ও টুরু একসঙ্গে বলে উঠলো—বাপরে! কি বড় মাছটা!

—মাছ ?

সন্তুর গলায় সন্দেহের সুর।

টুরু রাগের সুরে বললে—মাছ না ? তবে কি ? তোর সব কথাতেই এমন একটা ভাব দেখাস যে তুই খুব বুঝিস আর কেউ কিছু না—

সন্তু কিন্তু ততক্ষণ ডাঙার দিকে চলচে। যেতে যেতে বল্লে—এত রাত্তিরে এই নির্জ্জন জায়গায় একগলা জলে—না, সবাই চলে এসো—

—কেন রে ?

—ও মাছ নয়।

—মাছ না ? তবে কি ? কুমীর ?

—কুমীর কি না জানিনে, কিন্তু যত বড় মাছই হোক, ওরকম শব্দ তো করবে না। চলে আয় সবাই।

টুরু ততক্ষণে কিন্তু কাছিটা হাত দিয়ে ধরেচে। সে নিজে ওদের ডেকে এনেচে। মাছ চুরির জন্যেই এনেচে, এখন যদি সন্তু ক্রমাগত ওর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে, তবে ওর মান থাকে কোথায় ? প্রাণ আগে না মান আগে ?

পরক্ষণেই দেখা গেল কিসে টুরুকে গভীরতর জলের দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেচে।

সন্তু বল্লে—ধর ধর—ও হাবু, দেখিস কি হাঁ ক'রে ? ধর—

দুজনে মিলে টুরুর হাত ধরে টেনে বুক-জলে নিয়ে এসে দাঁড করালে।

টুরু হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—পা জড়িয়ে গিয়েছিল কাছিতে—মাছ এমন টান দিলে যে তোরা না ধরলে আমায় আজ জলসই করেছিল আর একটু হোলে—বড় মাছ—

সন্তু বল্লে—ও মাছ নয়।

—আবার বলে মাছ নয় ? কি তবে ওটা ?

—তা জানিনে। মাছ ওরকম শব্দ করে না। জল থেকে উঠে এসো সবাই—

টুরু আবার গিয়ে কাছি ধরলো। বল্লে—শীগগির আয়, সবাই মিলে দে টান—এইবার ওঠাবো—

হাবু ওর সঙ্গে কাছিতে হাত দিলে। সন্তুও এগিয়ে গেল।

হাবু বল্লে—টান দে—দে টান—

ওরা প্রাণপণে টানতে লাগলো কাছি ধরে। সন্তু বল্লে—বাব্বাঃ—যেন একটা পাহাড় বাঁধা আছে কাছির আগায়—

টুরু বল্লে—ভালো কথা, মাছ যদি না হবে, তবে গদাই জেলে ওটাকে কাছিতে যখন বাঁধলে, তখন দেখতে পেলে না ওটা তিমি কি কুমীর? এ কথার উত্তর দাও—

হঠাৎ সন্তু চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে হাবু কোথায় গেল? হাবু কোথায়? তলিয়ে গিয়েচে—সর্ব্বনাশ হয়েচে!

দুজনে মিলে ডুব দিতেই হাবুর একখানা হাত সন্তুর হাতে ঠেকতেই সন্তু জলের ওপর হাবুকে নিয়ে ভেসে উঠলো—তারপরে ওকে ডাঙার দিকে টানতে লাগলো। হাবু জল গিলতে গিলতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—ডুবিয়ে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমায়—আমি ভাই আর যাবো না—

টুরু বল্লে—কাপুরুষ কোথাকার—ফের আয়।—ধর বলচি!

অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে সত্যই ওরা কাছির প্রান্তে বাঁধা মাছটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে এল। সন্তু বল্লে—এ কি রকম মাছ? ওর গা দেখা যাচ্ছে না, টুরু ছুরি মার ওর গায়ে—ছুরি মার—

ওর কথা শেষ হয়নি এমন সময় ওর চোখের সামনে টুরু অথৈ জলের দিকে একখানা সোলার মত ভেসে চললো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেঁচাতে লাগলো—ধর আমাকে—ধর ভাই—গেলাম—গেলাম—

আবার ওরা ওকে টেনে নিয়ে এলো।

তখন ওদের রোখ চেপে গিয়েচে। মাছটা তুলবেই। আরো আধঘণ্টা প্রাণপণে ধস্তাধস্তি চললো আবার। ছুরি চালাচ্ছে টুরু যখনই সুবিধে পাচ্চে। মাছ কাবু হয়ে পড়চে ক্রমশঃ। টুরুর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপচে।

সকলে মিলে টানতে টানতে কাছি-সুদ্ধ প্রকাণ্ড মাছটা ডাঙায় টেনে তুললে। তখনও সেটা আছড়াচ্চে আর লাফাচ্চে। ভোঁস ভোঁস করে হাওয়া বেরুচ্চে ওর মুখ দিয়ে।

সেখানটাতে জ্যোৎস্না পড়েচে।

সন্তু চীৎকার করে বলে উঠলো—একি সর্ব্বনাশ রে! এ তো মাছ নয়—তখুনি তোদের বললাম···ত্মাখ্ চেয়ে জ্যোৎস্নার আলোয়—

টুকু তখনও বলচে—কি তবে? মাছ নয় তো কি?

সন্তু বল্লে—সরে পালিয়ে আয়—কাছে যাস্‌নে ও আস্ত যম—দেখচিসনে ওটা কি জিনিস? প্রকাণ্ড কামট! প্রাণে বেঁচে গিইচি সবাই। দেখছিসনে ওর মুখে বর্শি এখনো বিধে আছে। গদাই ভোর রাত্তিরে মাছ ধরেচে বর্শিতে, ভেবেচে মাছ হবে, মস্ত মাছটা। তখন বর্শি বিঁধে নির্জীব হয়ে পড়েছিল বলে জোর জবরদস্তি করতে পারেনি। এখনো নিজমূর্ত্তি ধরতে পারেনি আলটাগ্‌রায় বর্শি বেঁধা রয়েচে, তাই। নইলে আজ আমাদের রক্তে জল লাল হয়ে উঠতো—

হাবু আর টুকু শিউরে উঠলো। কামট! যার নামে ঝুনো জেলেরা পর্য্যন্ত আঁৎকে ওঠে। আস্ত যমই বটে। ভগবান খুব বাঁচিয়ে দিয়েচেন আজ!

সন্তু বলে—দড়ি কেটে দে—নইলে গদাই একা যদি কাল ওটাকে তুলতে আসে, বলা যায় না কি হয়। এখনো ওটা মরেনি।

টুকু ক্ষিপ্রহস্তে দড়ি কেটে বিশালকায় হিংস্র জলজন্তুটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিলে।

বেসাতি

ভীষণ বর্ষার দিন।

নিরুপমার জ্বর আজ ক'দিন ছাড়ে না। শিউলিপাতার রস খাওয়ালাম, দোকান থেকে পাঁচন এনে খাওয়ালাম, অসুখ কিছুতেই সারে না। স্কুলের ছুটি হওয়ার সময় রোজ ভাবি আজ বাড়ি গিয়ে দেখবো নিরুপমার জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। রাস্তা থেকে চেয়ে দেখি জানলা দিয়ে কি দেখা যাচ্চে—নিরুপমা বিছানায় উঠে বসেচে, না শুয়ে আছে।

রোজই নিরাশ হই। নিরুপমা শুয়ে আছে। ছটফট করচে, এপাশ ওপাশ করচে। মস্ত লেপমুড়ি দিয়েচে দেখলেই বুঝতে পারি ওর খুব জ্বর এসেচে।

সামান্য মাইনের মাষ্টারি করি, এগারোটি টাকা মাইনে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকি বাড়িতে। কায়ক্লেশে চলে। পৈতৃক আমলের ধানের জমিতে যদি দুটো ধান না হোত, তাহোলে সংসার একেবারেই চলতো না। নিরুপমা গোছালো গৃহিণী, যা আনি বেশ চালিয়ে দেয়। মাছ মাংস যুদ্ধের বাজারে আমাদের ঘরে আসা মুস্কিল। হাট থেকে চাঁদা মাছ, চুনো পুঁটি কিনে আনি। আমাদের স্কুলের বুড়ো পণ্ডিত কেশব ভট্চায্যি মাছ ভিক্ষে করে মেছোহাটায়। দোষ দিইনে ওকে, মাইনে পায় সাড়ে তিন টাকা। হ্যাঁ, সাড়ে তিন টাকা! বিশ্বাস করা মুস্কিল হয় জানি। কিন্তু এই সাড়ে তিন টাকার জন্যে বুড়ো কেশব ভট্চায্যি দুমাইল দূরবর্ত্তী তালকোণা-নকিবপুর গ্রাম থেকে দশটায় আসে, চারটেয় ফেরে।

কেশব পণ্ডিত মেছোহাটায় গিয়ে বলে—ওগো ও অক্রুর, তোমার নাতির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবা। বেশ নামতা পড়তো—আজ দুদিন আবার একটু ঢিল দিয়েচে। বলি ও কি মাছ? ট্যাংরা? দাও দিকি দুটো বাপু। তোমার নাতির কল্যাণে একদিন মাছ খেয়ে নিই। ভারি বুদ্ধিমান নাতি তোমার,

হীরের টুকরো—ত্যাও ওই চিংড়ি মাছটাও ত্যাও ওই সঙ্গে। পয়সা দিয়ে তো কিনবার ক্ষ্যামতা নেই।

আমি একদিন বলেছিলাম—পণ্ডিতমশাই, মাছ আমি কি ছুটো চাইলে পাইনে? পাই। কিন্তু আমার পিরবিত্তি হয় না—আপনি রোজ রোজ কেন চান?

—না চেয়ে ভায়া করি কি। বাড়িতে তিনটে নাতি, ছুটো নাতনী। মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হোলো, কেউ নেই সংসারে। আমি সব নিয়ে আগলে আছি। ওই সাড়ে তিন টাকাই আমার কাছে সাড়ে তিন মোহর—

—আপনার জামাই কতদিন মারা গিয়েচে?

—তা আজ হোল সাড়ে তিন বছর।

—সংসারে কে আছে?

—আমার মেয়ে হুটু আর তার কাচ্চা বাচ্চা। ওদের কেউ দেখবার থাকলে আমি কি আর ওদের নিয়ে বসে থাকি? আমারও বাডি কেউ নেই। বলি আগলে না রাখলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মেয়েডা কি ভেসে যাবে? তাই পড়ে আছি।

—আর কোনো আয় নেই?

—মাঝে মাঝে পূজোটা আসটা করি, কলাটা মুলোটা সিকিটা দুয়ানীটা এই আয়। তাতে কি হয়। এক বেলা খাওয়া হয়, এক বেলা হোলই না। মাছ ওরা খেতেই পায় না। কিনবার তো পয়সা জোটে না। কোনো রকমে চালানো। আমি মাছের ভক্ত নই, ওই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যি।

পাঠশালার মাষ্টার পণ্ডিতদের অবস্থার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ত্রৈমাসিক সাহায্য আজ ছ'মাস বন্ধ। ছাত্রদত্ত বেতন সবাই মিলে ভাগযোগ করে নিয়ে কোনো রকমে চলচে।

কেশব ভট্টচার্য্যির মাছ ভিক্ষে করা নিতান্ত হীন কাজ। তবে বেগুনটা, থোড়টা, মোচাটা এ আমরাও নিয়ে থাকি। স্কুলে সবই চাষীগৃহস্থদের ছেলে-মেয়ে। আমি জানি জেয়ালা বল্লভপুরের পতিরাম কাপালীর মোটা চাষ আছে

তরকারীর ; প্রধানতঃ বেগুনের। সেদিন তার মেয়ে লক্ষ্মী আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্লে—ও মাষ্টার মশাই, আমারে কাগজ কিনে দেন না—

—কি কাগজ ?

—লেখবার কাগজ।

—টাকা কে দিয়েচে ?

—মোর কাছে ছেল। আরও আছে—

—বলিস কি ? কটা ?

মেয়েটা একটা বালির খালি টিন উপুড় করে ঢাললে টেবিলের ওপর। আঠাবোটা টাকাবই নোট, সিকি দুয়ানি, কাঁচা টাকা। টিনটা ঢেলেই বল্লে—আপনি নেন মাষ্টার মশাই। এগুলো সব নেন। খাবাব কেনবেন। মুই কাপড় জামা কেনবো, গজা কেনবো, মুড়কি কেনবো—

আমি ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে বল্লাম—থাম, চুপ কর। এত টাকা তুই পেলি কোথায় আগে বল। দুটি মেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—মাষ্টার মশাই, লক্ষি আমাদের একটা করে পয়সা দিয়েচে জল খাবার খেতে—।

আমি বল্লাম—নিয়ে আয় সে পয়সা আমার কাছে—নিয়ে আয়—অমনি মেয়ে-দুটি দুটি চকচকে আধুলি নিযে এসে আমাব টেবিলে বেখে দিল।

—কি সর্ব্বনাশ, এরে পয়সা বলে ? হ্যাঁরে, এ কি জিনিস ?

মেয়ে দুটি অপ্রতিভমুখে এ ওর দিকে চাইতে লাগল।

—বল্ এ কি জিনিস ? পয়সা এর নাম ?

ওরা নির্ব্বাক। একজন সাহস সঞ্চয় করে আমাব দিকে বিজ্ঞের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—মাষ্টাব মশাই আমি বলবো ?

—বল্ না।

—নোট মাষ্টার মশাই।

—নোট ! নোট মানে কি ?

—তবে সিকি ?

—না, এর নাম আধুলি—আট আনা। একটাকার অর্দ্ধেক।

—যা বসগে যা—

পতিরামকে খবর দিয়ে আনিয়ে তার পরদিন সব টাকা তার হাতে দিয়ে দিতে, সে মহা সন্তুষ্ট হয়ে বল্লে—হতভাগা মেয়েটা আমার বালিসের তলা থেকে টাকার থলি চুরি করে ছিল মাষ্টার মশায়। গরীবপুরের হাটের পটল বেচাব টাকা, উনিশ টাকা সাত আনা। খুঁজে আর পাইনে। পরিবার বলে আমি জানিনে। ভাইপো বলে আমি জানিনে। তবে একমুঠো টাকা নিলে কে? এখন জানা গেল ওই হতভাগা ছুঁড়ি টাকাগুলো সব নিয়ে চলে এসেছিল—হতভাগা ছুঁড়ির হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করবো আজ বাড়ি গিয়ে।

—না বাপু, ও অবোধ মেয়ে। ওর কি সে জ্ঞান আছে? নইলে আধুলিকে কখনো বলে নোট, কখনো বলে সিকি। সে জ্ঞান নেই। মারধরের দরকার নেই। মুখে শাসন করে দিও—ইয়ে, পটল কি রকম হোল এবার?

—তা মাষ্টার মশাই মন্দ নয়। হাটরাহাট ভুমণ আডাইমণ। পাঁচ কুড়ো ভূঁই শুধুই পটল করা হয়েছিল এবার।

—একদিন দুটো পটল খাওয়াও তোমার ক্ষেতের। শুনেছি তোমার ক্ষেতের পটল নাকি বড় ভালো—

পতিরাম খুসি হয়ে উৎসাহের স্বরে বল্লে—হাটের সেরা পটল মাষ্টার মশাই। ওই নতিডঙ্গা থেকে বিলেন পটলের লত এনেলাম। যেমন পাতলা খোসা, তেমনি মিষ্টি। লতও খুব তেজী, এক এক লতে পাঁচপণ করে উদ্ধ সংখ্যে। ভাবুন সে জিনিসটা কি।

—বাঃ বাঃ চমৎকার ফলন!

—এক একটা লত দশহাত বারোহাত লম্বা। বল্লি ভাববেন গপ্প কথা বলচে, তা নয়, পতিরাম জানে পটলের চাষ কি করে কত্তি হয়। লত পুঁতলিই কি পটল ফলে? ওর কারকিৎ চাই। কাল পাঠিয়ে দেবো দুসের পটল, খেয়ে দ্যাখবেন আপনি। না, দাম দিতি হবে কেন আপনার। ও কথাই তোলবেন না। ফি হাটে যা পারি পটল আপনি নেবেন, দাম দিতি হবে না।

আমরা এই রকম করেই চালাই সংসার। একথা অস্বীকার করতে চাইনে।

কিন্তু এবার নিরুপমার অসুখ নিয়ে বড় ফেরে পড়ে গেলাম। ওর অসুখ একই রকম চলেচে, বাড়েও না কমেও না। রোজ রোজ স্কুল থেকে ফিরে মনটা এমন দমে যায়!

তারপর কি, আমাদের গ্রামে পরস্পরে সহানুভূতি নেই আদৌ। আমার বাড়ি এই যে অসুখ, এই যে নিরুপমা সারাদিন বিছানায় একা পড়ে ছটফট করে (আর কোনো লোক নেই আমার পরিবারে), কেউ উঁকি মেরেও দেখবেন না। আমি যে গরীব, যদি বক্সীদের মত, কিংবা নিতাই হালদারের মত অবস্থা হোত—তবে আমাকে সাহায্য করবার লোকের কিছুমাত্র অভাব ঘটতো না। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুখে কে আসবে? স্কুলে যে ক'ঘণ্টা থাকি, ওর জন্যে মনটা এমন উতলা হয়। এমন একটা গভীর অনুকম্পা হয়, দুঃখ হয় ওর কষ্ট দেখে, নিরু খেতে ভালবাসে কিন্তু খেতে পায় না, পরতে ভালবাসে কিন্তু একখানা পারিজাত শাড়ী (তাও ছ'বছরের পুরাণো) ছাড়া আর কোন ভাল কাপড় নেই ওর—কোন সাধ মেটাতে পারিনি আমি।

আমায় কতদিন থেকে বলচে—আমায় একটা ব্লাউজ কিনে দেবে? আমার মোটে নেই—

সেদিন, আজ মাস দুইয়ের কথা, একদিন বল্লে—হ্যাগা, শোনো, একটা সাধ—একখানা ভালো শাড়ী পরি।

—কি শাড়ী?

—রঙিন শাড়ী। ওদের বাডী একটি বৌ, রাণাঘাটে বাড়ী; পরে এসেছিল—ওই রকম একটা—

বলেই সে লজ্জা সঙ্কোচের হাসি হাসে। জানে সেও যে, হবে না কোনো দিনই যুদ্ধের বাজারে বিশ-ত্রিশ টাকা দামের রঙীন শাড়ী কেনা, তবুও বলে। আমার সোজাসুজি বলতে বাধে, কষ্টও হয় যে দিতে পারবো না—সুতরাং বলি—দেবো, ঠিক দেবো—

—সবুজ শাড়ি, শিউলি পাতার রং, বুঝলে?

—কার কাছে দেখলে ?

—ওই রাণাঘাটের পিসিমা এসেচেন ও বাড়িতে। তাঁর ছেলের বৌ।

—বেশ।

—দেবে তো ?

—কেন দেবো না ?

নিরুপমা বুঝেও অবুঝের মত অনেক সময়ে বলে ছেলেমানুষের মত (বয়েসও অবিশ্যি এই পঁচিশ) তাতে আমার বড় মায়া হয়। ভাবি, কখনো যদি হাতে একসঙ্গে কুড়িটা টাকাও পাই, তবে নিরুর রঙীন শাড়ি আগে দেবো এনে।

সেবার বড্ড আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় নিরুর কাপড় একখানা দিতে পারবো।

দিগম্বর নন্দী এসে বল্লে—পণ্ডিত মশাই, একটা ছেলের হাত দেখে দেবেন ?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী না শুধু হাত ?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী করে দিতি পারবেন ?

—বলে ওই করতে করতে চুল পাকবো পাকবো হোল। হয় না হয় তোমাদের পাড়ার পঞ্চানন বিশ্বেসকে জিগ্যেস—

—জিগ্যেস আর কত্তি হবে না পণ্ডিত মশাই। কত লাগবে তাই শুনি।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না। ছেলেটা কে ?

—আমার বড় সম্বন্ধীর ছেলে। আমার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন হবে সামনের বুধবারে। তাতে ওরা সব আসচে কিনা ?

—তুমি তোমার ছোট ছেলের একখানা ঠিকুজি এই সময় তৈরী করে নাও না কেন ? এই সময় করাই ভালো। সস্তায় করে দেবো। পাঁচটা টাকা দিও।

দিগম্বর নন্দী বড় চাষী গৃহস্থ। সে রাজি হয়েই চলে গেল, মনে মনে ভাবলাম নিরুর রঙিন শাড়ী এবার নির্ঘাত হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওর সম্বন্ধীর সে ছেলে এলোই না। দিগম্বরের ছেলের ঠিকুজি তৈরী করে পাঁচটা টাকা পেয়েছিলাম অবিশ্যি।

রহমান ডাক্তার এ অঞ্চলের মধ্যে পসারওয়ালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ভিজিট নেন একটাকা করে। নিরুর অসুখ কিছুতেই যখন সারে না, তখন তাকে ডাকলাম। রহমান ডাক্তার ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে। আমার উঠোনে নেমে বল্লে—মাষ্টার মশাই আছেন ?

আমি সসম্ভ্রমে এগিয়ে নিয়ে এলাম।

—কি অসুখ ? কার ? মা ঠাকরুণের ?

—হ্যাঁ, আসুন। দেখুন দিকি ভাল করে।

—আপনার সংসারে আর লোক নেই ?

—না, তাতেই তো—

—তাইতো। কতদিন অসুখ ?

—হোল আজ দু হপ্তা।

রহমান ডাক্তার দেখে-শুনে চব্বিশ রকমের খুঁটি নাটি প্রশ্ন করে ওষুধ দিয়ে গেল। ভালো লোক, ভিজিটের টাকা নিতে চাইলে না আমার কাছে। বল্লে—ও কি ? টাকা ? না থাক থাক—আপনি দেবেন না—

—না নিতে হবে।

—তা কখন হয় ? আমাব ছেলেটা পড়ে আপনার স্কুলে। আপনি তার মাষ্টার মশায়। টাকা দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ নয় এখানে। তারদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন দয়া করে। ওষুধটা আনিয়ে নিন আমার ডাক্তারখানা থেকে। বেদানার রস খেতে দেবেন। গ্লুকোজ আনিয়ে নিন একটা।

স্কুল থেকে টাকা হাওলাত নিলাম পাঁচটা। ওষুধ জিনিসপত্র সব আনাই বাজার থেকে।

নিরু নাকি সুরে বলে—আঁমি বাঁর্লি খাঁবো নাঁ—

—খাও লক্ষ্মীটি। খেতে হয়—

—আমি ওঁ খেঁতে পাঁরি নে—

—না খেলে কি জ্বর ছাড়ে ? খেয়ে নাও—

—আঁমাকে সন্দেশ কিঁনে দেঁবে ? সন্দেশ খাঁবো—

—সেরে ওঠো। দেব বই কি? নিশ্চয় দোবো—

—দেবে ঠিক?

—দেবো, ঠিক দেবো।

সব জিনিসই ওকে বলি দেবো দেবো। না পারি ভালো একখানা শাড়ী দিতে, না পারি ব্লাউজ দিতে। না কখনো পারি কিছু ভালো খাওয়াতে। মনে পড়লো একবার পাশের বাড়ির সনাতন রায় খাসি কেটে ভাগ দিচ্ছিলেন, আড়াই টাকা সের। ওদের বাড়ির বড় খাসিটা, চব্বিশ সের মাংস হয়েছিল। নিরু বল্লে—হ্যাঁগা, মাংস নেবে? বটঠাকুরদের বাড়ি। কদ্দিন মাংস খাইনি—নিয়ে এসো না একটু। একপোয়া নিয়ে এসো গিয়ে। বেশি দামের মাংস ওর বেশী আর নিতে পারবো না। দুজনে ওই খাবো এখন—তুমি নিয়ে এসো—আমি বাটনা বেটে রাখি—

কিন্তু ওরা একপোয়া মাংসের খদ্দের শুনে নাক সেঁটকালে। অন্ততঃ একসের নিতেই হবে। অত বড় খাসি একপোয়া আধপোয়া করে ভাগ করতে হোলে চলে না। দেড় সের দুসের মাংসেব খদ্দেররা সব কচুর পাতা কলার পাতা হাতে করে বসে আছে।

সেবার নিরুকে এসে বলেছিলাম—তুমি ভেবো না, ইস্কুলের ওদিক থেকে মাংসের ভাগ যদি পাই, একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবে তো?

ঠিক আনবো। এই মাসের মধ্যিই—

সে আজ ছ'মাস হয়ে গেল। মাংস আনাও হয় নি, ওকে খাওয়ানোও হয়নি।

রাত্রে নিরুপমা জ্বরের ঘোরে ভুল বকে যখন, তখন কেবল এই কথাই মনে হয়, ও একদিন মাংস খেতে চেয়েছিল, ওকে খাওয়ানো হয় নি, ও কতদিন একখানা রঙীন শাড়ী চেয়েছিল, ওকে কিনে দেওয়া হয়নি। যদি ও না বাঁচে? তবে ওর এই সব কথা কোথায় লেখা থাকবে?

রাত্রে কেউ থাকে না বাড়িতে। আমি নিরুর বিছানার পাশে একা

বসে আছি। রাত্রে অনেক সময় মানুষ চিনতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলে—'কে? বসে কে? কে গো ওখানে?' আমি ওকে পাখার হাওয়া দিই, মাথায় জলপটি লাগাই। গ্লুকোজের জল খাওয়াই। বসে বসে ভাবি কাল জগন্নাথ বক্‌সিদের বাড়ি গিয়ে জানাব আমার দুঃখু। রাত্রে একা থাকতে পারিনে রুগী নিয়ে। কোনও একটা সাহস পাইনে। তার ওপর মন হু হু করে, যেন কান্না আসে। অনেক রাত্রে একটু ঢুলুনি এসেচে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙলো কি একটা শব্দ শুনে। ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি নিরুপমা বিছানায় নেই। ঘরের দোর খোলা। ছুটে রোয়াকে গিয়ে দেখি নিরু টলতে টলতে রোয়াক পার হয়ে পৈঠেতে নামতে যাচ্চে। আমি খপ করে ওর হাত ধরে বল্লাম—এসো এসো—যাচ্চ কোথায়?

নিরুপমা চীৎকার করে গান জুড়ে দিলে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে

তোমার শাওড়ি বলে দিয়েচে বেগুন

কোটোসে—

আমি বল্লাম—ও নিরু, ছিঃ ওরকম চেঁচিও না। চেঁচাতে নেই। ঘরের মধ্যে এসো—

নিরু ধপ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়লো। জ্ঞানকাণ্ড নেই, এলোমেলো অবস্থা কাপড় চোপড়ের। আমি অনেক করে বুঝিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। এমন দুঃখু হোলো মনে, গরীব বলে কি কেউ এতবড় বিপদে অমনি দেখে না?

কাল বক্‌সিদের বাড়ি গিয়ে সব খুলে বলবো। দেখি যদি ওদের দয়া হয়।

রাত্রি কোন রকমে কাটলো। খানিক পরে পূবদিকে ফর্সা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্‌সিদের বাড়ি গিয়ে বিপদ জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করার মতলব আমার কোথায় মিলিয়ে গেল। সঙ্কোচ হয় বলতে, ও আমি পারবো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমাদের মত গরীবের তিনিই অবলম্বন।

রহমান ডাক্তার সকালে এলে আমি রাত্রের ঘটনা বল্লাম।

ডাক্তার বল্লে—হাই ফিভার হয়েছিল—তাই অমন করছিলেন। মাথায় জল দিলেন না কেন? রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন। আর নার্সিং যেন ভাল হয়—উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবেন না। বেডপ্যান একটা পাঠিয়ে দেবো এখন আমার কমপাউণ্ডারের হাতে।

একাই ওষুধ দিই, একাই বাতাস করি, একাই বেডপ্যান ধরি।

আহা, মিথ্যে কথা বলবো না। পরদিন ঘাটে নাইতে গিয়ে মুখুয্যে পাড়ার ঘাটের পাড়ের উঁচু জঙ্গলে ওল তুলচি সাবল দিয়ে, জীবন মুখুয্যের বড় মেয়ে আশালতা বল্লে—কে, কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা। ওল তুলচি একটা। পাতা বেশ হলদে হয়ে এসেচে, বড় ওলটা।

—কাকীমার অসুখ নাকি কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা, বড্ড কষ্ট হচ্চে।

—দেখাশুনা করচে কে?

—আমি। আর কে করবে?

আশা বল্লে—আহাহা, একা আপনি? রাত্রেও? আপনার তো বড্ড কষ্ট হচ্চে; মেয়েমানুষের অসুখের নার্সিং কি পুরুষ দিয়ে হয়? আমায় যে যেতে দেবে না কাকাবাবু। গেলে পাঁচটা কথা ওঠাবে। গাঁ যে কি রকম তা তো জানেন? নইলে আমি রাত্রে আপনাদের বাড়ি যেতাম কাকাবাবু—জাগতাম সারারাত—

—না মা, বেঁচে থাকো। ভাল হোক। যেতে হবে না, মুখে বল্লে এই যথেষ্ট মা। ভাল হোক তোমার ভাল হোক।

ওল তুলে জলে নামতে নামতে বল্লাম। আশালতা সিক্ত-বস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। ইচ্ছা ওর, আরো কিছু বলে। আমি বল্লাম—মা, তুমি যাও—

—কাকাবাবু, দিনমানে কাকীমার কাছে কে থাকে?

—কেউ না মা। তবে দিনমানে সে ভালো থাকে এক রকম। জ্বরের বাড় রাত্তিরে—

সেই দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আশা নিরুপমার বিছানায় বসে বাতাস করচে ওকে। বড় ভাল লেগেছিল আমার। বড় লোক না হোলেও ওর বাবা জীবন মুখুয্যে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তার মেয়ে এসেচে আমার মত দরিদ্র স্কুল মাষ্টারের স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। বেশ লাগলো। বড় ভাল লাগলো। তাব পর আশা আমার চা করে দিলে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে।

—খাবার কিছু নেই কাকাবাবু?

—খাবার? আমি তো কিছু খাইনে মা এসময়—

—দাঁড়ান, আসচি—

বলেই ও চলে গেল এবং একটু পরেই একবাটি মুড়ি ও আটখানা কাটা-শসার ফালি আঁচলে ঢেকে নিয়ে এসে বাড়ি ঢুকলো।

—খান কাকাবাবু।

—এ মা তোমার অনেষ্য ব্যাপার—

—কিচ্ছু অনেষ্য না। জল খান আপনি।

—ভাল হোক মা, তোমার ভাল হোক। তুমি চলে যাও এখন, মা, আমি এসেচি, আমি দেখাশুনো কববো এখন।

গাঁ ভালো না। কে কি বলবে, সোমত্ত মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে আশা। তারপর আর ও আসেওনি। বোধ হয় আর ওকে আসতে দেয়নি ওর বাড়ীর লোকে।

নিরুপমা সেরে উঠলো দিন-দশেক পরে। ওকে ভাত রেঁধে খাইয়ে তবে ইস্কুলে যাই। আর এত লোভ বেড়ে গিয়েচে ওর। সারাদিন কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করে। অধিকাংশই কুপথ্য। কুপথ্যের মধ্যে দু-একটা যার নাম করে, তা কিনে দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত। আটা ময়দা কিছু নেই। মহকুমার সাপ্লাই অফিসারের কাছে একদিন গেলাম—নইলে ওকে

কি খেতে দেবো রাত্রে। নিবারণ ময়রার দোকানে গেলুম কিছু খাবার কিনতে। এ অঞ্চলের ওস্তাদ কারিগর নিবারণ। রসগোল্লা, পানতুয়া, বরফি, সন্দেশ, জিলিপি যা তৈরি করে! আমি শহরে আসবো শুনে নিরুপমা বলে দিয়েচে চুপিচুপি—খাবার এনো বুঝলে? খাবার আনবে। ভাল দেখে।

—কি খাবার খেতে ইচ্ছে হয়?

—যা তুমি ভাল বোঝো।

আমি সাজানো খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখলাম বড় কড়া থেকে নিবারণ ভাল সন্দেশ নামিয়ে জোড়া সন্দেশ গড়চে। নিবারণের বিখ্যাত জোড়া সন্দেশ। বড্ড ইচ্ছে হোল নিরুপমার জন্যে জোড়া সন্দেশ নিয়ে যেতে। ও কখনো খায়নি সে। কি খুসিই হবে জোড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে গেলে।

পকেট খুঁজে দেখলাম। হাতে চার আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে খাবার কিনবার। তাতে মোটে হবে একখানা জোড়া সন্দেশ—আর বাকি থাকবে এক আনা।

দু-তিনবার খেয়েছিলাম। কি সুন্দর জোড়া সন্দেশগুলো!

নিরুপমার হাতে যদি নিয়ে গিয়ে দিতে পারতাম!

কিন্তু একখানা সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার চাইতে এক পোয়া কুঁচো গজা নিয়ে যাওয়া ভালো। অনেকগুলো পাওয়া যাবে। মনের সাধ মনেই চেপে বল্লাম—কুঁচো গজা আছে? কত করে সের? দাও তিন ছটাক—বেশ টাট্‌কা?

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই নিরুপমা জিগ্যেস করলে—খাবার এনেচ? কি দেখি?

আমি হাসিমুখে পুঁটুলিটি দেখিয়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন অনেকখানি গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার এই পুঁটুলির মধ্যে সঞ্চিত।

নিরুপমা কৌতুহলের সঙ্গে বলে—ওর কি নাম।

নিবারণ ময়রার কুঁচো গজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লাম আমি। এমন দেখিনি, এ জেলায় আর হয় না। বিখ্যাত কুঁচো গজা। নিবারণের কুঁচো গজা কলকাতা পর্য্যন্ত যায়। বড় বড় লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে বড্ড

দাম। পাওয়াই যায় না। যেমন কড়া থেকে নামে, অমনি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। অতি কষ্টে আধপোয়া সংগ্রহ করে এনেচি। খেয়ে দেখো।

নিরুপমা বলে—না। তুমি আগে দুখানা খাও—আরও দুখানা নাও না ?

তারপর মহাখুসির সঙ্গে খেতে খেতে বলে—বাঃ সত্যি! কি চমৎকার জিনিস।…না ?

কলহান্তরিতা

শ্যাম সরকার আমাকে ডেকে বল্লে—শোনো বাবা, একটু বোসো।

হাট-বাজার করে ফিরছিলাম, বেলা হয়েচে, বেশি বসবার সময়ও নেই।

শ্যাম সরকার বুড়ো হয়েচে, বড্ড বকে। আমার এখন ওব বকুনি শুনবার সময় নেই। তবুও বল্লাম—কাকা, ভাল আছেন?

শ্যাম সরকার ওর দোতলা বাড়ীর সামনে বসে মালা জপ করছে। আমি ওকে মালা জপ করতে দেখচি এই ভাবে বসে আজ ত্রিশ বছর। লোকটা ঝানু বিষয়ী, টাকা ধার দিয়ে তার স্থদ থেকে চালায়। আবার গীতার ব্যাখ্যাও কবতে শুনেচি ওকে। এদিকে মামলা মোকদ্দমা করতে ছাড়ে না, তাও দেখতে পাই।

শ্যাম সরকার বল্লে—এসো বাবা, বোসো। চোখেও আজকাল খুব ভাল দেখিনে—একটা কথা শোনো। আমার একটা উপায় করে দাও বাবা—

—কি উপায় কাকা? কিসের উপায়?

—আমার ছেলে বিষ্টু বড বদ হয়ে উঠেছে। দিন রাত কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমায় বলে, বিষয়-সম্পত্তির ভাগ দ্যাও। বসে বসে খাবে কেবল। কোন কাজ করবে না। ওবেলা তো আমায় মারতে এসেছিল। এর একটা—

—কাকীমা কিছু বলেন না?

—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? সেও ছেলের দিকে। দু'জনে মিলে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এর একটা বিহিত করো বাবা—

—আমি এর কি বিহিত করবো বলুন। বিষ্টু আমার কথা কি শুনবে? মিছে মিছে অপমান হওয়া।

—অপমান করলেই হোল অমনি? তোমরা হোলে সোনার চাঁদ ছেলে—তোমরা এর একটা প্রিতিকার করতে পারবে না?

—মাপ করবেন কাকা। আপনাদের গৃহবিবাদের মধ্যে আমাদের থাকবার দরকারই বা কি? ও আমার দ্বারা হবে না।

এ দিনটি কোনো রকমে নিস্তার পেয়ে এলাম বটে কিন্তু পরদিন আবার শ্যাম কাকা আমায় ধরেচে রাস্তায়। বিকেলে তাস-খেলার আড্ডায় বেরুচ্ছি, শ্যাম কাকা বল্লেন—শোনো বাবা—

—এখন একটু ব্যস্ত আছি কাকা। শুনবো এখন অন্য সময়—

—ওই বাবাজি তোমাদের দোষ। একটুখানি দাঁড়াও না? এই দেখো তোমার খুড়ীমা আমায় আজ কি করে মেরেছে—

—মেরেচেন? খুড়ীমা।

—মিথ্যে কথা বলচি বাবা? হয় না হয় তুমি ললিতকে জিজ্ঞেস করে দেখো। আমায় রক্ষে কর বাবা। আমায় আজ খেতে দেয়নি, দুটো ভাতও দেয়নি। আমায় বাঁচাও—

কথা শেষ করে শ্যাম কাকা আমার হাত দুটো খপ করে ধরে ফেল্লেন।

অগত্যা শ্যাম সরকারের বাড়ির মধ্যে আমায় ঢুকতে হোল।

ঢুকে বল্লাম—ও খুড়ীমা—

শ্যাম কাকার বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলো ঘর। ওদিকে সান-বাঁধানো বড় রোয়াক, টিউবওয়েল, পাকা রান্নাঘর, গোহাল—বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহস্থালীর সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্ব্বত্র। কিন্তু ওদের সংসারে যে শান্তি নেই, তা এ গ্রামে সকলেই জানে। এদের বাইরের ঠাট যেমনই হোক, ভিতরে অনেক পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

খুড়ীমা সম্ভবতঃ তালের বড়া ভাজবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন, কারণ হাতে তালের গাদ, হলদে রস মাখা। রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে খুড়ীমা রোয়াকে দাঁড়ালেন—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, লাল চওড়া পাড় শাড়ী পরণে, পায়ে আলতা, মাথায় একঢাল চুল, মুখশ্রীতে প্রৌঢ়া সুন্দরীর গম্ভীর, স্থির সৌন্দর্য্য। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কে, রমেশ? কি বাবা?

আমতা আমতা করে বল্লাম—এই খুড়ীমা, বল্‌চি কি—

কথা বেধে যেতে লাগলো। খুড়ীমার ঝঙ্কার ও দাপটের খ্যাতি এ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেচে অনেক কাল থেকে। সকলেই জানে কি রকম চিজ্ তিনি। এই সন্দে বেলা শেষে বাধাবো কি গোলমাল? ভাল হাঙ্গামাতেই পড়েছি। বেশি পরোপকারেব প্রবৃত্তি থাকলেই এ বকম বিপদে পডতে হয়, এ আমি লক্ষ্য করে আসচি বরাবর থেকে।

খুড়ীমা রুক্ষ নীরস কণ্ঠে বল্লেন—আমার আবার সময় নেই। তালের গোলা মাখচি দেখতেই পাচ্চ বাপু। কি বলবে বল—

খুড়ীমা ঝানু মেয়েমানুষ, নিশ্চয়ই বুঝেচেন আমি কি বলবো!

শক্তি সঞ্চয় করে বল্লাম—কাকা না-কি আজ খাননি—ওঁর এ বয়সে ঠিক সময়ে খেতে না পেলে—

খুড়ীমা আমার সামনে এসে হাত নেড়ে বল্লেন—ওই বুড়ো বদমায়েস লাগিয়েচে বুঝি? তা লাগিয়ে আমার কি কববেন শুনি? গাঁয়ের লোকে কি চাল কেটে আমায় উঠিয়ে তাড়িয়ে দেবে গাঁ থেকে? হ্যাঁ খেতে দিইনি! বুড়োর বচনে পিত্তি জ্বলে যায়, সে বচন যদি শোনো বাবা, তখন তুমিও বলবে যে হ্যাঁ বচন বটে একখানা। আমার ওই ধুলো-গুঁড়োটুকু নিয়ে সংসার করচি বাবা, আমার শিব রাত্তিরের শল্‌তে টিম্ টিম্ করে জ্বলচে, ওই আমার বিষ্টু—ওকে বুড়ো বলে কি না, পয়সা না রোজকার করিস, তো বাড়ি থেকে বেবো। তুমিই বলো দেখি বাবা, বিষ্টু বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে কবে বেড়াবে, আর আমি বসে থেকে ওই বুড়ো ভুতকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াবো? তাই বলি ছাই খেতে দেবো তোমাকে। তাই খেতে দিইনি—সোজা কথাই তোমাকে বল্লাম, এখন তুমি আমার কি করবে করো—

আমি জিভ কেটে বল্লাম,—সে কি কথা খুড়ীমা, ছি ছি—আমি আপনার সন্তানের মত—এ সব কথা আমাকে—

খুড়ীমা বল্লেন—বোসো বাবা, তালের বড়া ভাজচি, খেয়ে যাও গরম গরম—

আমি বল্লাম—সে হবে এখন। কাকাকে আপাততঃ কিছু খেতে দিন, ওঁর খাওয়া হয়নি সারাদিন। ডেকে আনবো?

খুড়ীমা মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন—না। অত আত্যিস্যিয়ো তোমার করবার কোন দরকার দেখি নে তো!

—দরকার বেশ দেখা যাচ্চে, খুড়ীমা! কাকাকে ডেকে আনি, দেখুন—বুড়ো মানুষ, ও-রকম করবেন না। কিছু খেতে দিন ওঁকে।

—আচ্ছা, একটু পরে যেও। তালের বড়া একখোলা নামাই—পোড়ার মুখে না হয় গরম গরম দুখানা দেবেন এখন বুড়ো, যমের অরুচি—

—ছি খুড়ীমা, অমন করে বলা আপনার উচিত হয়? বলবেন না ও-রকম।

পিছনের দিকে দোরের কাছে কখন শ্যাম কাকা এসে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়েছেন, টের পাইনি। তিনি অমনি দোর থেকে বলে উঠলেন—শুনচো তো বাবাজি? শোনো নিজের কানে শুনে যাও তোমার খুড়ীমার বচন—মধু ঢেলে দিচ্চে একেবারে কানে। ওই মাগী যদি এ ভাবে—সংসার উচ্ছন্ন দিলে ওই বদমাইস্ মাগীই তো—

এর পর উভয়ে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। আমি কিছুক্ষণ উভয়পক্ষকে নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টার পরে সরে পড়বার জোগাড় করচি, এমন সময় খুড়ীমা ডাকলেন—কোথায় যাও বাবা? দাড়াও, তালের বড়া খেয়ে যাও—

আর তালের বড়া! যে কাণ্ডটা দুজনে সন্দে বেলা বাধালেন, ভাবলাম একবার বলি।

মুখে বল্লাম—আচ্ছা, খুড়ীমা; আমি বসচি। আপনারা দয়া করে একটু চুপ করবেন?

খুড়ীমা আর কোনো কথাটি না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শ্যাম কাকা আমাকে চুপি চুপি বল্লেন—তুমি একটু বলো বাবাজি, দু'খানা তালের বড়া যেন আমাকেও দেয়—বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি ততক্ষণ হরিনামটা সেরে নিই—সন্দে হয়ে এল—

আমায় কিছু বলতে হোলো না। খুড়ীমা দুটো কাঁসার জাম-বাটিতে তালের বড়া নিয়ে এসে বল্লেন—অমুক বুড়ো (খুড়ীমার ব্যবহৃত বিশেষণটি অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না) কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তিনি সন্ধে আহ্নিক করতে গেলেন—

—ওর মুণ্ডু আহ্নিক। ডেকে দ্যাও, খেয়ে তিনি আমার মাথা কিনুন—

আমি ডেকে আনলাম বাইরের ঘর থেকে।

খুড়ীমা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিলেন শ্যাম কাকাকে ডেকে আনবার পরে। আমার অস্তিত্বই যেন তিনি ভুলে গেলেন। শ্যাম কাকাকে তাদের বড়া খাওয়াতেই তাঁর সারা মন যেন ঢেলে দিলেন। তবে সম্বোধনের বাণী মধুর ছিল না, মধুর তো দূরের কথা, শিষ্ট বা ভদ্রও ছিল না।

নমুনা কিছু নীচে দেওয়া গেল ঃ—

গেলো—যমের অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসো'ও না হয়? কোন্ মড়ার ঘাটে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি রয়েচে যে আজ সারা দিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি? আমার তো সব্ব দোষ, দেশ পিরথিম তো ছেয়ে ফেললে আমার অপযশ গেয়ে। এখন তারা এসে তোমায় গিলতে দিক দেখি? বলি, মুখে বলতে সবাই আছে, দুটি রেঁধে পিণ্ডি সেদ্ধ করবার বেলা আর কোন্ যম তোমার আছে শুনি? দাঁড়াও, আর দু'খানা গরম গরম এনে দিই—তাড়াতাড়ি কিসের শুনি? বলে সেই এক কড়ার মুরোদ নেই, নাম গঙ্গারাম—ইদিকে তেজটুকু আছে ষোল আনার ওপর সতেরো আনা। সেবার আশ্বিন মাসে যখন দাঁত ছরকুটে বিছানায় পড়ে জরে বেহুঁস হয়েছিলে, তখন দেখেনি এসে পাড়ার লোক? এই মাগীর তো যত দোষ, এই মাগী না থাকলে যে কোন্ কালে শ্মশানঘাট আলো করতে? শেয়াল-শকুনে হাড-মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করতো? পেট ভরেচে? না গুড দিয়ে দু'খানা খাবে? ভাল হয়েচে? তবু তো নারকোল পড়েনি। বাড়ীর লোক নারকোল এনে দেবে তবে তো হবে? তা না সকাল থেকে শোনো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া—যম ভুলে রয়েচে কেন? যমে তোমায় নেয় না? পান ছেঁচে আনবো? ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্চে—পূবে স্যাঁওটা দেখা দিয়েচে—এণ্ডিখানা নিয়ে আসি, গায়ে দিয়ে গিয়ে বোসো—নইলে সর্দ্দি-কাশির থুতু-গয়েরে ঘর ভরিয়ে ফেললে সে

তোমার যমকে ডেকে এনে পরিষ্কার করিও বলে দিচ্ছি স্পষ্ট কথা—এই ন্যাও গামছা—

খুড়ীমার স্বামি-শুশ্রূষার আতিশয্যে আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম, একবার মাত্র আমার বাটিতে তালের বড়া দিয়ে আর আমার দিকে তিনি ফিরেও চাইলেন না।

উল্টোরথ

আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে নতুন একঘর লোক এসে বাস করলো। আমি সেবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম ছ'সাত মাসের জন্যে। এসে দেখি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীদের ভিটের পশ্চিম-পাড়ে যে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তা কারা কেটে ফেলে সেখানে দু'তিনখানা টিনের ঘর তুলেছে। কাতুকে জিগ্যেস করলাম—একি রে? আমাদের সেই নোনা গাছ?

কাতু ঠোঁট উল্টে বল্লে—সে হয়ে গিয়েছে—

—হয়ে গিয়েছে মানে?

—এখানে যে নতুন লোক এসে ঘর বেঁধেছে। মামার বাড়ি ছিলে, দেশের খবরই বা কি রাখো?

—কে রে?

—অনেক দূরে কোথায় থাকতো, সেখান থেকে উঠে এসেছে।

—ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। নাম সত্য চক্রবর্ত্তী।

—চল গিয়ে দেখে আসি—ছেলেপিলে আছে আমাদের বয়সী?

—দু'জন আছে। ভাব হয়ে গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। নিন্তু আর পটল। ভারী ফরসা দেখতে, আর হিন্দি-মিন্দি বলে—

আমি মজা দেখতে নতুন বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম। আমার বড় দুঃখ হচ্ছিল, অমন নোনা গাছটা, যাতে নোনা পেকে গাছ আলো করতো, যা একটা খেলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যেতো, সেই অমন নোনা গাছটা এরা কেটে ফেলে কি কাণ্ড করেছে দেখো দিখিনি!

বাড়িতে ঢুকতেই দেখি খুব ফরসা একটি দাড়িওয়ালা লোক পশ্চিমদিকের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। কাতু বল্লে—দাঁড়া। ওই সত্য চক্কত্তি। বড্ড রাগী লোক।

—বকবে ?

—বকে, বাড়ি ঢুকতে দেয় না।

সাহস করে আর একটু এগিয়ে যেতেই সত্য চক্কত্তি আমাকে দেখতে পেয়ে বল্লে—কে ?

আমি সাহস সঞ্চয় করে বল্লাম—আমি।

—আমিটা কে ?

—আমার নাম তোতন্। এই গাঁয়ে বাড়ি।

—ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ।

—বাপের নাম কি ?

—শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়।

—ও, অনাদি দাদাব ছেলে তুমি। কবে এলে ? এখানে তো তোমরা ছিলে না ?

—কাল এসেছি।

—বেশ। এখন যাও, বাড়ীতে ছেলেরা কেউ নেই। সব পাঠশালায় গিয়েছে পডতে। তোমবা পড়াশুনো কর না বুঝি ? এ-গাঁয়ে ছেলেরা সব খেলেই বেড়ায়।

আমার রাগ হলো। আমি পড়িনে, উনি কি করে জানলেন ? যাক বাবা, যাবো না ওদের বাড়ি। ওদের বাড়ি না গেলে কি ভাত হজম হবে না ?

এইভাবে প্রথম সত্য চক্কত্তিদের সঙ্গে আলাপ হোল। সত্য চক্কত্তির দুই ছেলে নিস্তু আর পটলের সঙ্গে কী ভাবই হয়ে গেল আমাদের। বেশ ছেলে ওরা, দেখতেও যেমন, লেখাপড়াতেও তেমনি। আমরা এক সঙ্গেই পাঠশালায় আর স্কুলে পড়লাম। ওদের বাড়িতে সর্ব্বদা যাতায়াত করি। কিন্তু সুখ ছিল না ওদের বাবা সত্য চক্কত্তির জন্যে।

কি মারই ছেলেদের দিত লোকটা! সারা বাল্যকাল নিস্তুদা আর পটলের প্রাণে সুখ ছিল না, মনে সুখ ছিল না। কি কড়া শাসনের ওপরই সর্ব্বদা

রাখতো বাবা ওদের। পান থেকে চুন খসছে কি দুড়দাড় মার। সেবার আমি আর নিন্তু আর পটল খেলা করছি, এমন সময় কি নিয়ে নিন্তুদার সঙ্গে পটলের ঝগড়া বাধলো। নিন্তুদা বল্লে—তুই আমার বড পেন্‌সিলটা নিলি তখন ফেরত দে—

পটল বল্লে—তুমি আমাব খাতা ছিঁডে দিয়েছ দাদা, পেন্‌সিল দেবো না—

—আলবৎ দিবি।

—কক্ষনো দেবো না—

—এই নে, এই নে—বাঁদব কোথাকার, বলেই নিন্তু বসিয়ে দিলে—তুই চড।

—তুমিও এই নাও—এই নাও, বলে পটলও কসিয়ে দিলে—আর তুই চড।

এমন সময়ে ওদের বাবা সত্য চক্কত্তি অগ্নিমূত্তিতে ঘরে ঢুকে বল্লেন—কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? এই রকম করে পড়া হচ্ছে বুঝি? শম্ভ নিশম্ভুর যুদ্ধ বাধিয়েচ দেখছি? বলেই দু'জনকে সে কি দুড়দাড়িয়ে মাব। গরুকেও মানুষ অমন মাব মারে না। নিন্তুদা তো মাব খেয়ে উঠোনে এসে ছিট্‌কে পডলো, পটল কোণে গিয়ে জড়সড হযে দাঁডালো কাঁপতে কাঁপতে। আমি সরে পডলাম বেগতিক বুঝে। এই বকম দেখে এসেছি সারা বাল্যকাল। নিন্তুদা আর পটল বাপের ভযে জুজু। কোন জায়গায় ইচ্ছেমত খেলতে যাওয়ার জো নেই।

নিন্তুদার বিয়ে হলো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। ওদের সকলের ছোটভাই পিণ্টুর বয়স, এই সময় বছর চারেক। আমি আই-এ পড়ি কলকাতায়। বিয়ের চিঠি পেয়ে বাড়ি এলাম। নিন্তুদার বিয়ে, আমোদ আহ্লাদ করা যাবে। নিন্তুদা ডাক্তারি পড়ে, ভালো ছেলে কলেজেব।

পটল গিয়ে ওর বাবাকে বল্লে—বাবা, দাদা বলছে পকেট ঘড়ি নেবে না।

সত্য চক্কত্তি বিস্ময়ের স্বরে বল্লেন—অ্যাঁ? কি?

—বলছে পকেট ঘড়ি নেবে না। আজকাল রিষ্ট ওয়াচের রেওয়াজ হয়েছে, পকেট ঘড়ি কেউ পরে না—তাই বলছিল—

—পরে না? কোথায় গেল সে হারামজাদা, ডাকো ইদিকে—

নিন্তুদা তো সঙ্কুচিত ভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখ চুন হয়ে গিয়েছে ভয়ে।

সত্য চক্কত্তি বল্লেন—তুমি পকেট ঘড়ি নেবে না? বড্ড তালেবর হয়েছ বুঝি? বাপের কথার উপর কথা? বাজ্জাৎ পাজি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব জানো? যাও, তোমার বিয়ে করতে হবে না। তুমি কালই কলকাতায় চলে যাও—

সেদিন বাড়িতে লোকজনের ভিড, শাঁখ বাজছে, নান্দীমুখের চাল কোটা হচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে ওদের মা বার হয়ে এলেন। এসে ছেলের পক্ষ হয়ে স্বামীকে দু'কথা শোনালেন।

—তোমার না হয় তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে—কিন্তু দুধের ছেলে, ওর অত হিসেবজ্ঞান এখনো হয়নি তোমার মত। আজকের দিনে বাছাকে কোনো কথা বলতে পারবে না বলে দিচ্চি—

—অত বড কথা বলতে ওর সাহস হয়? আজকাল কালে কালে সব হচ্ছে কি?

—অত তোমাকে দেখতে হবে না। যাও, বাইরে গিয়ে বসো খানিকক্ষণ।

নিন্তুদা সে যাত্রা রেহাই পেল।

আমাকে বিয়ের পর নিন্তুদা দুঃখু করে বলেছিল—দেখলি তো ভাই বাবার রাগ। একটা হাতঘড়ির কথা বলতে গেলাম, তা বাবা—

আমি বল্লাম বাদ দে। গুরুজনদের কথায় দুঃখু করতে নেই।

—বাবা বোঝেন না। একটা হাতঘড়ি থাকলে আমাকে কেমন মানাতো?

—এর পর কিনে পরিস্। নে এখন।

দিন চলে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটে গেল। পঁচিশ বছর কেটে গেল তখনকার বালক, এখন যৌবনের সীমা পার হতে চলেছে।

দেশে এসেছি অনেক দিন পরে। অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে দেশের। যেখানে আগে কোঠা-বাড়ি দেখেছি এখন সেখানে ভাঙা ইঁটের স্তূপ আর

জঙ্গল। বাড়ির লোক মরে-হেজে গিয়েছে, যারা বেঁচে আছে, তারা বিদেশে চাকরি করে। দেশে যাতায়াত নেই। আগে যাদের হীন অবস্থা দেখেছি, এখন তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে, বাড়ীতে তাদের গোলাপালা, গরু বাছুর। ভাতের অভাব নেই বাড়িতে। এই রকম এক গৃহস্থের বাড়িতে সকালবেলা বেড়াতে গেলাম।

এ বাড়ির কর্ত্তাকে ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। নাম ছিল মাধব পণ্ডিত। এরা গোয়ালার বামুন, অর্থাৎ গোয়ালাদের বাড়ি দশকর্ম্ম ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে অতি কষ্টে পরিবারের অন্নের গ্রাস সংগ্রহ করতেন পণ্ডিত মশায়। এদের একখানা চালাঘর দেখেছি ছেলেবেলায়, তখন মাধব পণ্ডিতের বড় ছেলে জয়কেষ্ট (আমার বয়েস) খিদের জ্বালায় সকালবেলায় পাকা বীচে শসা খেতো মায়ের কাছ থেকে চেয়ে, কুটনোর থালা থেকে তুলে নিয়ে। পণ্ডিত মশাই কোঁচড়ে করে চাল আনতেন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ধার করে, তবে হাঁড়ি চড়তো। মাধব পণ্ডিত কুলের অম্বল বড় ভালবাসতেন। একদিন আমার বেশ মনে আছে, জয়কেষ্ট আর তার বোন নন্দি দু'জনে এক কোঁচড় কুল পেড়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে। ওরা পা বিছিয়ে কুল খেতে বসলো রান্নাঘরের দাওয়ায়, কারণ ওদের সদাই খিদে। আমি মুখ ফুটে চাইলাম, আমার হাতে জয়কেষ্ট গোনা একটা কুল দিলে। নন্দি বল্লে—ওকি দাদা, একটা দিতে নেই, আর একটা দে ?

—তোর ভাগ থেকে দে না—

নন্দি আমাকে এক মুঠো কুল দিলে। আজও তার সেই দরাজ হাতের কথা আমার মনে পড়ে বেশ।

এমন সময়ে মাধব পণ্ডিত কোথা থেকে এসে ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কুল দেখে বলে উঠলেন—বেশ, বেশ। কুল কোথায় পেলি ? আর খাস্ নে, রেখে দে। কুলের অম্বল হবে।

জয়কেষ্ট বল্লে—না বাবা, আমরা খাবো—

নন্দি বল্লে—চুপ কর দাদা। বাবা কুলের অম্বল ভালবাসে, তুমি জানো

না? না, বাবা আমরা আর কুল খাব না। মাকে দিয়ে আসছি অম্বল করতে। কিন্তু গুড় নেই বলো, অম্বল হবে কি দিয়ে?

মাধব পণ্ডিত মুখ চুন করে বল্লে—ও গুড় নেই? তবে আর কি হবে।

আমি তখনি উঠলাম। আমাদের বাড়ি অনেক গুড়-পাটালি আছে, কারণ আমাদের উনিশটা খেজুর গাছ কাটা হয় প্রতি বছর। মাকে গিয়ে বলতেই মা খানিকটা পাটালি দিলেন। আমি নন্দিদের বাড়ি এসে সেই পাটালি নন্দির মার হাতে দিয়ে বল্লাম—পণ্ডিত কাকাকে কুলের অম্বল করে দিও কাকীমা।

আর আজ তাদের পরিবর্ত্তন দেখে অবাক হতে হবে।

জয়কেষ্ট পাটের ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। একতলা কোঠা বাড়ি, টিউব কল, সান বাঁধানো উঠান, গোয়ালে আট-দশটা ভালো ভালো গাই গরু, ধানের গোলা—আমি দেখে অবাক। জয়কেষ্ট এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, চিনি কাপড় দেওয়ার কমিটির সেক্রেটারি, শিক্ষা-কর আদায় করবার কর্ত্তা। লোকে মানে, চেনে, ভয় করে। না করলে উপায় নেই, তোমার শিক্ষাকর বাড়লো, চিনির বরাদ্দ কমলো, কাপড় দু'তিন চালান পাওয়া গেল না। জয়কেষ্টকে এখন গ্রামের লোক বলে বড়বাবু। মাধব পণ্ডিত অনেকদিন মারা গিয়েছেন শুনলাম। সংসারের সুখভোগ তার অদৃষ্টে ছিল না। কিন্তু সকলের চেয়ে পরিবর্ত্তন হয়েছে নিস্তুদা'দের বাড়িতে।

জয়কেষ্ট চা খাওয়াতে খাওয়াতে আমাকে সব বল্লে।

নিস্তুদা এখানে থাকে না, শহরে কোথায় চাকরি করে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকে। পটল এখন রেলে কাজ করে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে লালমণির হাটে থাকে রেলের বাসায়। বাড়িতে আছেন শুধু সত্য চক্কত্তি, আর ছোট ছেলে পিণ্টু। এখন অবিশ্যি তার বয়স ত্রিশ বছরের ওপর।

আমি বল্লাম—পিণ্টু চাকরি করে না।

—চাকরি করবে কি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে থাকে আর পাগলামি করে।

—সত্য চক্কত্তি কিছু বলেন না ?

—সত্য চক্কত্তি আর সে সত্য চক্কত্তি নেই। এখন তিনি ছেলের ভয়ে জুজু। তাঁকে পর্য্যন্ত এক একদিন মারতে যায়।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—সে কি ? সত্য কাকাকে ?

—হ্যাঁ। জিনিসপত্র ফেলে ভেঙে চুরমার করে। চালডাল ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। ওই দেখো না আমার বাড়িতে ওই কালই বস্তাবন্দী করে রেখে গিয়েছেন, ওঁর ঘরে রাখলে পিণ্টু বিক্রি করে ফেলবে, নয়তো নষ্ট করে ফেলবে।

—কেউ কিছু বলে না ?

—কে বলবে ? পাগলকে কে রাগাতে যাবে ? গিয়ে দেখ সেখানে তা'হলেই বুঝতে পারবে ?

কিছুক্ষণ পরে গেলাম সত্য চক্কত্তি মশায়ের বাড়ি। তিনি দেখি চুপচাপ বসে তামাক টানছেন। কুশল প্রশ্ন জিগ্যেস করার পরে চারিদিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে দেখে বল্লেন– আর বাবা, আমার থাকা না থাকা। আমার যে কি কষ্ট বাবা। পিণ্টু আমাকে কোনো জিনিস খেতে দেয় না—চালডাল দেখো ওই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে—আমার কোন জিনিসে হাত দেবার জো নেই—আর—

হঠাৎ সত্যকাকা চুপ করে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টু কোথা থেকে এসে বলে উঠলো—কি বলা হচ্ছে আমার নামে ? কি বলা হচ্ছে বুড়োর ? আমি খেতে দিই নে ? আমি চালডাল চাবি দিয়ে রাখি ? রাখিই তো ! নইলে তুমি বিক্রি করে মেরে দাও। তোমাকে আর আমি জানিনে, বুড়ো ঘুঘু ?

আমি বলে উঠলাম—ছি ছি, এসব কি হচ্ছে পিণ্টু ? উনি তোমার বাবা না ? বাবাকে ওই সব বলতে তোমার মুখে বাধে না ?

ও বল্লে—উনি বাবা তাই কি ? আমি ও সব মানিনে। আমার যা খুশি তাই করবো।

—তা বলে ওঁকে তুমি খেতে দেবে না? ঘরে চাবি দিয়ে রাখবে?

পিণ্টুর বাবা বল্লেন—আর বাবা আমাকে—পিণ্টুর ধমক খেয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। পিণ্টু হেঁকে বলে উঠলো—চুপ—

আমি বল্লাম—ওকি পিণ্টু?

—কিছু না। উনি বাজে কথা বলছেন—

—আর তুমি খুব ভালোকথা বলছো? বাবাকে এ-সব কথা বলতে হয় কোথায় শিখলে?

ওকে ধমক দিয়ে তখনকার মত চুপ করিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম এ রোগের ওষুধ এত সহজে হবে না। বৃদ্ধ সত্য চক্কত্তির জন্যে দুঃখ হোল. সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সত্য চক্কত্তি। যার ভয়ে ছেলেরা জুজু হয়ে থাকতো।

তারপর যে ক'দিন দেশে ছিলাম বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বসতাম। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন তাঁর দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এদিক ওদিক চেয়ে ফিস্ ফিস করে কথা বলেন। ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, ছেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পর্যান্ত করতে ভরসা পান না। আমি তাঁকে বল্লাম—নিস্তুদা কোথায় থাকে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন? কিংবা পটলের কাছে লালমণির হাটে?

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সে সব জায়গায় মন টেকে না বাবা। নিস্তুর বাসায় জায়গা কম, লোকজনের ভিড়। পটলের তো রেলের কোয়ার্টার, পাখীর খাঁচা। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, হাত পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যেস, সে সব জায়গায় হাঁফ লাগে আমার। নইলে তাদের দোষ নেই, তারা নিয়ে যেতে চায়। তা আমার নিতান্ত খারাপ অদৃষ্ট বাবা। আমি কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি তাই দেখো। তোমার কাকীমাও যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা'হলে বুড়ো বয়সে আমাকে ছোট ছেলের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়?

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছু কথা খুঁজে পেলাম না।

মুক্তপুরুষ হরিদাস

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-টি এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাষ্টারী করিতেছেন। সম্প্রতি মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাষ্টারের কড়া তাগাদা —হাফ ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাষ্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ উইক্‌স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে করে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্চে।

হরিদাস বাবু বিনীত ভাবে বললেন—চেষ্টা তো করচি স্যর, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্চি না, দিচ্চি যত শিগ্‌গির হয়—

আবার তিনদিন গেল। আবার হেডমাষ্টার কড়া তাগাদা দেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্চেন না?

—দিচ্চি স্যর, আর দু—পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবেনা। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অনপ্লেজ্যাণ্ট ব্যাপার করতে চাইনে, কিন্তু—

তার উপর বাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ে দিন রাত খাই খাই করিতেছে তাহাদের খাওয়ার আকাঙ্খা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন বাপ-মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার হরিদাস বাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলিবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়িতে গিয়াই শুনিতে হয়,

গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ি ত্যাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা হিম করে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ির মেয়েদের থাকিত! তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায়ও তো কিছুই দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাষ্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল, পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুণ। হেডমাষ্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন করে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েচেন, খাতাগুলো ফেরং নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাস বাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া একখানা কি বই পড়িতেছে হরিদাস বাবু দেখিতে পাইলেন। দুবার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে? অঙ্ক কসো—তাড়াতাড়ি কসো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কসিবে কেন, ভগবান যে অদ্য তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেকপাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানি পড়িতে লাগিল। এবার

হরিদাস বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কান সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহল বশতঃ বইখানি খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'বীর-বাণী', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাস বাবু ধর্ম্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালই জানিতেন। বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশানি ছিল না। বাড়িতে চা খাইয়া হরিদাস বইখানি লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি। সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাষ্টার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, স্বসংবেদ্য অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ-যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগতকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্য তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাষ্টার ব্রহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্য ফোর্থ ক্লাসের নুরুল হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের উপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না দুঃস্থ, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দুজনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুশি, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস, তুমি জানো না সিষ্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু তুমিও জানোনা, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাস বাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলেরে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যর। আরও আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যিকরে—আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির 'অধ্যাত্ম-দর্শন'।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দুখানি পড়েন। দুদিন টিউশ্যানি কামাই করিলেন। হরিদাস বাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দুদিন ছেলে পড়াতে যাওনি যে? আজও তো হিম হয়ে বসে আছ। টুইশ্যানি আছে তো?

—থাকবে না কেন?

—তবে যাওনা কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়।

সকালের ছেলে পড়ান চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম জোগাবে কোথা থেকে। আজও যাবেনা নাকি ?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে। লালমোহন ঘোষ কড়া লোক, সেবার সেই জানো তো ? বেনুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাস বাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন। অগত্যা বই লইয়াই চলেন ছাত্রের বাড়ি। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক। লালমোহন বাড়ি ছিলনা তাই রক্ষা। হরিদাস বাবু আর আগেব মত অত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন, কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে জ্ঞানের মূল্য রহিল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে, অনেক দূরে অবস্থান কবিতেছে। সেবা ধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারিকে একটা পয়সাও দেয় নাই. ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাস বাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব ?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যর ?

হরিদাস বাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের। লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন তাই বলছি স্তব।

—কি বলছিলেন ?

—বকছিলেন। জানেনতো বাবাকে। ওই রকম লোক।

—তা কি হবে এখন ? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কসিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পাবেন যে জগৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।"

"যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার বর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।"

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাহার হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন ?

পুনরায়—"মুক্ত-পুরুষসহ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয় ? দিব্যজ্ঞান তাহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল।

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না।

যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষ-বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন-কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টুইশ্যানির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দুদিনের জন্য লীলাখেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্ব্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আল্‌তাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নীচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দুখানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাষ্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়িতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ না কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটা লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটা কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটা রেলিং হইতে নিচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্ছ কি? দুপয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ি আসচে কিনা, তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটি চলিয়া গেলে হরিদাস বাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকার মত।

বেলা চারটার পর হরিদাস বাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ী আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার পুলের তলায় নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অন্য একটি বাণ্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ি হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ি আসিয়া পৌছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বাধা

সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে ?

হরিদাস বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে ?

—হ্যাঁ গো, মাইনে হয়নি ?

—না।

—কেন হয়নি ? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদেব মাইনে হয়।

—আজও হয়নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজরী মেছুনি রোজ তাগাদা আবম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুলে খাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে— তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো ?

—চালও বাডন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে ? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ি থেকে আর বেরুনো যাচ্চে না।

—না যায়, বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমাব ঝগড়া শুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমাব বই এনে দিলে না ?

—কি বই ?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাষ্টাব রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর স্কুলে যেতে হবেনা। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না।

স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিষ, তিনি এসবের উর্দ্ধে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবেনা। বকিতেছে বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিলনা। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম-রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন। কিসের বলে? জ্ঞানের বলে। ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পর দিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে-পালায়। কি সুন্দর বিহঙ্গ কাকলী। এ সব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মতত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাস বাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিযাছেন, এমন সময় হাজরী মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেচেন? দুদিন আমি আপনার দেখাই পাইনে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও-মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলে চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতে হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা এখন যা—বেলা হোলে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনি চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুস্কিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি-দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাকগে। আশাতে আসক্তির বন্ধন? সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত না তিনি? তিনি না অজর, অমর আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আণ্ডিল, একটা পয়সার সদ্ব্যয় নাই। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আরও একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হওয়ার যো নাই। বাড়ীতেও তিষ্ঠিবার যো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্কুলের হরিদাস বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগার তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালী দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়ীতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁগা, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরী করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো করে বলো পোড়ারমুখো হেডমাষ্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাস বাবু আজ স্কুলে গিয়া, গুটি গুটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাস বাবুর পা কাঁপিতেছে। জিব শুকাইয়া

গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? বড় কড়া হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টারের অফিসে কম্পিত পদে দুরু-দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেডমাষ্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এত দিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত-পুরুষ হরিদাস সে চশমা-পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যব, ইয়ে—বাড়িতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রণা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তাব ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যর। একে পযসার অভাব ডাক্তারে—ওষুধেই বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যার—

হেডমাষ্টাব বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ বিসুখ হতে পারে সেটা আশ্চর্য্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইণ্টারেস্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনাব থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, একরম হোলে হবিদাস বাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হোতে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যর এক্সকিউজ করুন দয়া করে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যর তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, ঠায় শিয়রে জেগে বসে আছি স্যর—চোখে দেখা যায় না সে যন্ত্রণা—

হরিদাস বাবু কাঁদো কাঁদো হইলেন।

অন্তর্জলি

বাংলা ১১৭৫ সাল।

ডুমুরদহের গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান-রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে অন্তর্জলির জন্যে আনা হয়েছে। সঙ্গে আছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ, ভ্রাতুষ্পুত্র রামনিধি এবং পাঁচালীর দলের পুরাতন দোহার ষষ্ঠি সামন্ত। তা ছাড়া আছে একটি চাকর, নাম যদু।

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে ডুমুরদ' ঘাটে অন্তর্জলীর জন্যে আনা হয়েছে, এ সংবাদ লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো অতি অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো সকাল থেকে। যারা আসে, তারা চক্রবর্ত্তী মশায়কে দেখে পায়ের ধূলো নেয়, চলে যায়। কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, তাহোলে অল্প সময়ে বেজায় ভীড় জমে যাবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীপ্রসাদ সকলকে হাতজোড় করে বলচে, "আমার বাবার শেষকালের ক্রিয়াগুলো একটু শান্তিতে করতে দ্যান আমাদের। ভিড করবেন না, দয়া করে চলে যান। দেখা তো হোল, আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে কি দেখবেন? তামাক এখানে না, এগিয়ে গিয়ে খান। বাঁধানো বটতলায় চলে যান।"

সুবোধ লোকেরা চলে যাচ্ছে। বলতে বলতে যাচ্ছে, "আহা—হা! দীনদয়াল চক্কত্তি চললেন! আহা—হা!"

ওদের চোখে জল।

"অমন অনুপ্রাস আর কেউ লাগাতে পারবে না। আহা-হা!

"বাংলা দেশের হয়ে গেল। কি লোকই চলে যাচ্ছে।"

"ইন্দ্রপাত হয়ে গেল!"

"দেখলেও পুণ্যি হয়। চেহারাখানা যেন সাক্ষাৎ শিব! চললেন!"

"বর্দ্ধমান আজ অন্ধকার হয়ে গেল!"

"বর্দ্ধমানে বুঝি মশায়ের বাড়ী? উনি সারা বাংলাদেশের, শুধু বর্দ্ধমান কেন?"

"ওঁর জন্মভূমি বর্দ্ধমান তাই বলচি। বর্দ্ধমানের চাঁপা গ্রামে। কাঁকট পরগণা।"

দুর্ব্বুদ্ধি-লোকেরা একবার চলে গিয়ে আবার ঘুরে ফিরে আসে।

"নাভিশ্বাস উঠেছে নাকি? ও, এখনো ওঠে নি? আহা হা!"

"যাবোই তো মশায়, থাকতে আসিনি। অমন লোকটা আহা! চলে যাচ্ছেন! আহা হা!"

"আমাদের ঝাঁপাই গ্রামে কুণ্ডুদের বাড়ি পূজোর সময় বাঁধা আসর ছিল চক্রবর্ত্তী মশায়ের। লোকে বসে গান শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতো। ওঁর গান সকলের মুখে মুখে।"

নিকটেই বর্দ্ধমান রাজার কাছারী। সেখানকার নায়েব নরহরি জোয়ার্দ্দার স্বয়ং এসেছেন দেখতে। দুর্দ্ধর্ষ নরহরি জোয়ারদার, এ পরগণায় সাত সাতটা দাঙ্গায় যিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে লেঠেল-পাইক পরিচালনা করেছেন, বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় তাঁর প্রতাপে। নরহরি বসে আছেন চক্রবর্ত্তী মশায়ের বিছানার কিছু দূরে, বলছেন,—"কোনো ত্রুটি না হয় ব্যবস্থার। সব আমি ঠিক করে দেবো। আমার পাইক এখানে বসে থাকবে সন্দে পর্য্যন্ত। যখন যা দরকার হয়—"

দেবীপ্রসাদ বল্লে—"আপনার দয়া, নায়েব মশায়। রাত্রে আজ দুজন লেঠেল এখানে থাকা দরকার। এখনো নাভিশ্বাস ওঠেনি, রাত নেবে বলে মনে হচ্চে।

"এক্ষুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ভেবো না বাবাজি। তুমি আর তোমার ভাই শুধু চুপ করে বসে থাকো। এ আমাদের দায়।"

"আপনি আর একবার আসবেন তো?"

"আমি আসবো সন্ধ্যাহ্নিক সেরে। দপ্তরের আজ বড় ঝঞ্ঝাট। কিস্তির সময় কিনা। ওটা কি হে?"

"আজ্ঞে এখানা বাবার গানের খাতা। উনি বল্লেন, অন্তর্জলি করবার সময়ে ওঁর হাতে একখানা রাখতে।"

"দেখি দেখি!"

নরহরি খাতাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বল্লেন, "শ্যামা সঙ্গীত। আহা কি অনুপ্রাসের ঘটা! কি বাঁধুনি—এইখানটা দ্যাখো—বল্ দেখি মা কোন্ রঙ্গে ত্রিবিভঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গ দ্যাখো—আহা হা! ক্ষণজন্মা পুরুষ! আর জন্মাবে না। হয়ে গেল! পিদিম নিভে গেল!"

দেবীপ্রসাদের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে লাগলো! নরহরি বল্লেন, "সংসার অনিত্য। চিরদিন বাপ মা থাকে না। কেঁদো না বাবাজি, হ্যাঁ, বাপের মত বাপ। যাকে বলে দিগ্‌বিজয়ী বাপ। চোখের জল ফেলবার বহু সময় পাবে বাবাজি, এখন যাতে ওঁর শেষ কাজগুলো ঠিক মত করতে পারো—"

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীর বয়েস হয়েছে ছিয়াত্তর সাতাত্তর। দোহারা চেহারা, বেশ ফর্সা রং, এই বয়সেও বেশ সুপুরুষ। কবির গান গেয়ে অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। স্বগ্রামে প্রায় ৫০।৬০ বিঘে জমি ও কয়েকটি আম-কাঁটাল বাগানের তিনি মালিক। এই জমির মধ্যে অর্দ্ধেক আন্দাজ বর্দ্ধমান রাজার ব্রহ্মোত্তর। বাকি তিনি কিনেছিলেন। তাঁর সদ্ব্যয়ও ছিল যথেষ্ট, বাড়িতে দুর্গোৎসব করতেন খুব জাঁকিয়ে, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন কাঙ্গালীভোজন যেভাবে নিষ্পন্ন হোত, এদেশের অনেকে তেমনটি চোখে দেখেনি। গত বৎসর ছিল ঘোর দুর্ভিক্ষের বছর, চালের মণ সাড়ে তিন টাকা চার টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল, অনেককে অনাহারে থাকতে হয়েছিল, তাতেও চক্রবর্ত্তী মশায় পিতৃশ্রাদ্ধের কোনো অঙ্গ বাদ দেন নি। পাঁচমণ ধানের খইমুড়কি বিলিয়ে দিলেন কাঙালীদের মধ্যে।

দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে ওই যে রাখা হয়েছে গঙ্গার ঘাটের চালাঘরে। মাটিতেই বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে! সমস্তদিন কেটে গেল, ওঁর নাভিশ্বাস উঠলো না। সন্ধ্যার সময় তিনি ক্ষীণস্বরে ছেলেদের কাছে ডাকলেন।

—"বাবা পটল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া—"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

—"লোকজনের ভিড় কমেছে?"

—"এখন সবাই চলে গিয়েচে বাবা।"

—"বোসো এখানে।"

—"এখন কেমন আছেন।"

—"ভালো না! সংকীর্ত্তন এল না?"

—"গঙ্গাটিকুরির কীর্ত্তন আনতে লোক গিয়েচে, এলো বলে।"

—"আমায় একটু নাম শোনাও।"

—"বেশী কথা বলবেন না বাবা।"

দেবীপ্রসাদ বাবার মুখে কুসী করে গঙ্গাজল দিল। বল্লে, "একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন বাবা।"

বাইরে এসে সে লোকজনদের বল্লে, "বাবা এখনো দিব্যি কথাবার্ত্তা কইলেন। বেশ জ্ঞান আছে এখনো।"

একজন বল্লে, "থাকবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। ওসব লোক সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে। যে সে লোক তো নয়।"

সন্ধ্যা নেমে এল। নিস্তব্ধ তারা-ভরা রাত্রি।

শ্মশান-চালার অদূরে কয়েকজন লোক বসে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ওরা ডুমুরদ'র হাট থেকে কুমড়ো কিনে এনেচে, পটল কিনে এনেচে। ষষ্ঠী সামন্ত বসে কুমড়ো কুটচে। দেবীপ্রসাদ বল্লে, "ষষ্ঠী কাকা, বাবাকে একবার দেখতে গেলে না?"

—"দেখতে যাবো কি, কর্ত্তার মুখের দিকে তাকালে বুক ফেটে যাচ্ছে। আজ এগারো বছর কর্ত্তার সঙ্গে তেনার দলে ঘুরছি। কত বড় আসর মাৎ করেছেন কর্ত্তা। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন, ছোট ভাইয়ের মত। উনি চলে যাচ্চেন, আমার দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। খাবো কি তাই হয়েচে ভাবনা। তুমি দল করো বাবাঠাকুর, আমি সেই দলে আসবো। কর্ত্তার নামে দল চলবে।"

—"পাগল! আমি আর বাবা! গাইবে কে?"

—"গাইবে তুমি বাবা ঠাকুর। আমার পরামর্শ শোনো! সব শিখিয়ে পড়িয়ে দোবো। আমার সব ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানা আছে। সোনার দলটুকু, এ ছেড়ো না বাবা ঠাকুর, এতেই তোমাদের সংসারে লক্ষ্মী।"

—"আমার ভরসা হয় না ষষ্ঠী কাকা, দেখি কি হয়। বাবা যা রেখে যাচ্চেন, ভুভাইয়ের অভাব হবে না। দলের ঝন্‌ঝাটে আর যাবো না। ও সব আমার কর্ম্ম নয়।"

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে আজকার এই সব ব্যাপার, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন রয়েচেন, নাভিশ্বাস ওঠা তো দূরের কথা।

চোখ বুজে আছেন যে, সে শুধু ভীষণ শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যে।

এক একবার ছেলেদের ডাক দিচ্চেন, "বাবা পটল—বাবা রামু—এদিকে এসো—"

কিন্তু সে-ডাক ছেলেদের কানে গিয়ে পৌঁছুচ্চে না, আসলে চক্রবর্ত্তী মশায়ের মনেই সে-আহ্বানের আসন, কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হচ্চে না সে-ইচ্ছা, অথচ চক্রবর্ত্তী মশায় ভাবচেন, তিনি ঠিকই ডেকেচেন ছেলেদের।

"ওরা কেন আসচে না? তাই তো—"

চক্রবর্ত্তী মশায় আবার চোখ বুজলেন।

আজ সারাদিন তিনি অতীত-জীবনের বহু হারানো-মুহূর্ত্ত আবার আস্বাদ করেচেন। যা ভুলে গিয়েছিলেন, তা যে এত স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত ছিল স্মৃতির পটে কে তা ভেবেছিল?

প্রথম যৌবনের সেসব গৌরবময় দিন। হরু ঠাকুর তখন ছিলেন চক্রবর্ত্তী মশায়ের আদর্শ। ইলছোবা-মোল্লাই গ্রামের বারোয়ারিতে বড় আসরে হরু ঠাকুরের কবিগান যখন শোনেন, তখন কত বয়েস হবে তাঁর? বছর সতেরো-আঠারো হয়তো।

আজও মনে আছে সে-রাত্রের কথা।

ভাষার অমন ফুলঝুরি আর তিনি কখনো দেখেন নি। শোনেন নি। মনে

হোল যেন দেখচেন বিখ্যাত কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের মুখে-মুখে ভাষার সে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হরু ঠাকুর একদিকে, অন্যদিকে গদাধর মুখুয্যে—দুই বিখ্যাত কবিওয়ালা। আসরের লোকের মুখে শব্দ ছিল না। পুতুলের মত সবাই বসে আছে।

'সুধীর ধারে বহিছে এই ঘোরতরা রজনী
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুণমণি, ঘন সবাজ ঘন শুনি।
ঐ ময়ুব ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী
ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেউতি শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণে মোহ্ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে।
বিদ্যুত খদ্যোত দিবা জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশে দিনমণি
প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে সারিশুক থাকে দিবস রজনী।

সতেরো বছরের যুবকের চোখের সামনে হরু ঠাকুরের গান এক নতুন সৌন্দয্য জগৎ খুলে দিয়েছিল। সেদিন থেকে তাঁর মনে মনে দুরাশা জাগলো যদি কোনোদিন কবিওয়ালা হোতে পারেন, অমন ভাষার ফুলঝুরি ছোটাতে পারেন মুখে মুখে, তবেই জীবন সার্থক।

ভোর হয়ে গিয়েছিল আসর ভাঙতে। সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লোক, তাঁরই মত অল্প বয়স। দুজনে আসরের বাইরে এসে একটা গাছতলায় বসলেন। সঙ্গের সে-ছেলেটি অন্য কথাবার্ত্তা পাড়লে, কিন্তু দীনদয়ালের ওসব ভালো লাগছিল না।

তিনি সঙ্গীকে বল্লেন, "হরু ঠাকুর কোথায় বাসা করেচেন ভাই?"

সে বল্লে, "জয়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেন?"

—"দেখে আসি। অমন লোক!"

—"গদাধর মুখুয্যেও কম নয়। উনিও ওখানে আছেন।"

—"চলো যাই।"

—"সারা রাত গান করে এখন ওরা ঘুমুবে, না তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করবে। এখন যেওনা।"

—"তুমি বাড়ি যাও। পিসিমাকে বোলো আমি ওবেলা যাবো। ওঁদের একবার ভালো ক'রে না দেখে যাবো না। কিছু ভালো লাগচে না ভাই।"

সঙ্গী হেসে বল্লে, "পাগল হোলে নাকি? চলো বাড়ি যাই। কি হবে ওদের সঙ্গে দেখা করে?"

কিন্তু যুবক দীনদয়াল সেদিন বাড়ি ফিরে যান নি। হরু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার ফলে তাঁর নেশার ঘোর আরও বেড়ে গেল। এরা মানুষ না দেবতা? মানুষের মুখের ভাষা এমন সুন্দর হতে পারে?

আজ সেসব দিনের কথা এত মনে আসচে কেন?

আর একজনের কথা বড্ড মনে হয়।

সে একটি নব প্রস্ফুটিত নলিনীর মত নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল। জাতিতে ছিল কলু, ব্রাহ্মণেরা ওদের জল স্পর্শ করে না। কিন্তু আজ এ কথা ভেবে চক্রবর্ত্তী মশায়ের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্চে না যে তিনি তার রান্না ভাত খেয়েচেন। তার হাতের জল খেয়ে তৃপ্ত হয়েচেন। আজকার দিনের সাত্বিক, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীর সে-খবর কেউ জানে না।

আকাশে বাতাসে সেসব দিনে কেমন মাদকতা ছিল, মনে ভাবের অফুরন্ত জোয়ার অনুকূল-বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতো। র'সু নৃসিংহের সে-গান তখন সব সময় মনে গুনগুনিয়ে উঠতো ;—

সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়।

অথবা :—

মনে রইল সই মনের বেদনা
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হোল না
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

মুমূর্ষু দীনদয়াল মনে মনে হাসলেন।

আজকালকার ছেলে-ছোকরা কি বুঝবে সেসব প্রেমের কথা? ছেলে-বুড়ো নিয়েও কথা নয়, আসলে চাই প্রাণ। প্রাণের গভীরতা যদি না থাকে, অগভীর

ঘোলা-জলে সাঁতার কাটলে কি মহাসমুদ্রের বাণী শোনা যায়? মনে পড়লো কানাইহাটির জমিদার-বাড়ির নাটমন্দিরে নবাই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সে বিখ্যাত কবির লড়াই, যার ফলে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন দেশে বিদেশে—আজও সে সান্ধ্য-আসরটি, আসরের পাশের প্রাচীন কদম্ব-গাছটি, সেই ভাঙা শ্যামরায়ের মন্দিরের চূড়াটি, এতকাল পরেও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্চেন। নবাই ঠাকুর বিখ্যাত কবিওয়ালা। আর তিনি তখন সবে উঠচেন। লোক বলাবলি করতে লাগলো, এ ছোকরা এবার হাবুডুবু খাবে নবাই ঠাকুরের আসরে।

নবাই ঠাকুরের দোয়ারে গোপেশ্বর সাঁবুই এসে বিকেলে বল্লে, "ও ঠাকুর, তোমার পাখা উঠেচে?"

—"হ্যাঁ, এবার স্বর্গে যাবো।"

—"সাহস আছে তোমার। চলো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

—"কোথায় যাবো? কে পাঠিয়ে দিলেন?"

—"নবাই ঠাকুর।"

—"তাঁর এত মাথাব্যথা?"

—"এণ্টনি সাহেব ঘোল খেয়েছিল নবাই ঠাকুরের কাছে, জানো তো? তোমাকে আর ফুঁ খাটাতে হচ্চে না সেখানে। এসো, নবাই ঠাকুরের সঙ্গে একটা ষড় করো। আসরে যাতে—"

—"তোমাব নবাই ঠাকুরের ষড়্ করবার দরকার হয়, বলে দিও, তিনি যেন আমার বাসায় পায়ের ধূলো দেন। আমি তাঁর সেখানে যাবো না।"

—"এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার? আচ্ছা—"

দীনদয়াল নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন নবাই ঠাকুর তাঁর সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েচেন। যত বড় এবং যত বড় কবিওয়ালাই হোন না, অজ্ঞাতশক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনা-সামনি প্রকাশ্য আসরে নামতে ভয় পাবেনই। নিজের শক্তির ওপর অতটা বিশ্বাস কারো একটা থাকে না। বিশেষ করে ওঁরা নাম করা, ওঁদের সুনাম নষ্ট হবার ভয় আছে, দীনদয়াল ছোকরা-কবিওয়ালা, হেরে গেলেও লজ্জা নেই।

এই নবাই ঠাকুরই এণ্টনি সাহেবকে বলেছিল ;—

এ নহে এণ্টনি আমি একটা কথা জানতে চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই—

সঙ্গে সঙ্গে এণ্টনি সাহেবের প্রত্যুত্তরে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল :—

এই বাংলায় বাঙালীব বেশে আনন্দে আছি
হযে ঠাকুরেব সিংয়েব বাপেব জামাই কুর্ত্তিটুপি ছেড়েছি

ঠাকুর সিং নবাই ঠাকুরের অন্য নাম।

সন্ধ্যার পব আসব বসলো। কানাইহাটি মস্ত গাঁ, আসর ভর্ত্তি হয়ে গেল সন্ধ্যের আগেই। চারিধারে রটে গিয়েছিল বিখ্যাত নবাই ঠাকুরের সঙ্গে আসরে নামবে একজন ছোকরা-কবিওয়ালা। সবাই মজা দেখতে জড়ো হয়ে গেল, পাঁচ ছ' ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকেও পানের পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে ছোলার ছাতু আব তেঁতুল বেঁধে নিয়ে লোকে এসেচে মজা দেখতে, নবাই ঠাকুরেব প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকবা কেমন হাবুডুবু খায় নবাই ঠাকুরের হাতে, তাই দেখতে।

আসর বসবাব দেরী নেই।

জমিদারদের নাটমন্দিরের একদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের বসবাব আসন, অন্যদিকে কানাইহাটির বাবুদের বসবার তক্তপোষ ও তাকিয়া, বাবুদেব তখন নাম ডাক আছে মাত্র, কিন্তু সাবেক অবস্থা তখন আর ছিল না। হাতীশালা ছিল কিন্তু হাতীর সন্ধান ছিল না। ষোলো বেহারার বড পাল্কি নাটমন্দিরের পাশের ঘরে পড়েই থাকতো, কেউ চড়তো না তাতে। ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো হয়েচে, জাজিম পেতে দেওয়া হয়েচে কবির দলের লোকদেব জন্যে ঠিক আসরেব মাঝখানে। তারই পাশে ছিল সেই প্রাচীন কদম্বগাছটা, এখনো সেই আসর, সেই উৎসাহ ও কৌতূহলে-মত্ত শ্রোতৃবৃন্দের জনতা—ওই তো ডুমুরদ' শ্মশানঘাটের ওই শ্মশানবন্ধুদের বিশ্রাম করবার ঘরখানার মতই স্পষ্ট তাঁর কাছে। চোখেব সামনে বেশ দেখতে পাচ্চেন।

তাঁর নিজের দলের দোহার তখন ছিল চন্দ্র মল্লিক। বুড়ো মানুষ, অনেক

ভালো ভালো দল ঘুরে দাঁত পড়বার জন্যে চাকুরী খুইয়ে শেষে তাঁর দলে ঢোকে। বছর দুই পরেই মারা যায় লোকটা।

চন্দ্র বল্লে, "বাবা ঠাকুর, ওদের লোককে তাড়িয়ে দিযে ভালো করলে না। বড় জমকালো আসর হয়েচে। এতে হেরে গেলে বড় দুর্নাম রটবে—"

—"তোমার ভয় হচ্চে চন্দর খুড়ো?"

—"ভয় না, তবে তুমি ছেলেমানুষ, তাই ভাবছি।"

—"কিছু ভয় নেই। তুমি দেখে নিও—"

—"মস্ত বড় কবিওয়ালা কিনা ঠাকুর সিং, শেষে নাস্তানাবুদ না হোতে হয়।"

—"তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে উৎরে যাবো, দেখে নিও।"

সত্যি, সে-সন্ধ্যায় একটা নতুন প্রেরণা ও উৎসাহের জোয়ার তিনি অনুভব করলেন নিজের মনের মধ্যে। আজ এই সমাগত কৌতূহলোজ্জল জনসাধারণকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, শুধু ইতর-গালাগালি দিয়ে জয়লাভের মূল্য নেই, তিনি দেখাবেন ভাষার ও ভাবের মহিমা, নতুন ভাবের ঢেউ এনে দেবেন আজ কবির আসরে, গাইবেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গীত, সন্ধ্যার আকাশ থেকে সে প্রেরণা আসচে, আসচে ওই প্রাচীন কদম্ববৃক্ষের শ্যামল শাখাপ্রশাখার ইঙ্গিত থেকে, তিনি বুঝতে পেরেচেন আজ তার জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ সমাগত।

সেদিনের কথা ভাবলে আজও তার মনে সেই অপূর্ব্ব উন্মাদনা জাগে। এই মৃত্যুর দিনটিতেও। রসের ও ভাবের সে-পুলক মানুষকে অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী করে দেয় এক মুহূর্ত্তে। সকলে তা কি বুঝতে পারে?

সাধারণে তার খবর কি জানবে?

সে বুদ্ধি এবং ভাবের সে গভীরতা ক'জনের মধ্যে আছে?

এমন কি তাঁর নিজের ছেলেরাও তার সন্ধান রাখে না। ওদের মাতুল-বংশের বৈসয়িক স্থূল-মনের উত্তরাধিকার ওরা পেয়েছে, তার নিজের রসে-ভরা ছন্দের-অনুগত-ভাবসুষমায় অবগাহন-স্নান-করে-ওঠা মন ওরা লাভ করে নি।

কাকে কি বলবেন? কাকে কি বোঝাবেন?

তারপর আরম্ভ হোল কবির লড়াই। কিন্তু ইতর বা অশ্লীল একটা কথাও

উচ্চারণ করলেন না তিনি। নবাই ঠাকুর যা খুশি বলে চলুক, তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে আক্রমণ করবেন না এই সংকল্প নিয়েই তিনি আজ আসরে নেমেচেন।

বরং তিনি তার উল্টোটাই গাইলেন।

নবাই ঠাকুরের সৃজনী-প্রতিভার প্রশংসা করবেন তিনি এ আসরে।

কাব্যবন বিচরণ সোজা কথা নয়
কল্পনার ফুল যেথা ফুটে সমুচয়
ভাবের ভাবুক যিনি সুকবি-রতন
নবাই সে পুষ্পরাশি করেন চয়ন
বন্দি আমি তাঁর পদে নবাই সুন্দর
বাণীর দুলাল তাঁর সবই সুন্দর!

নবাই ঠাকুর ও তাঁর দোহার গোপেশ্বর অবাক হয়ে গেল, ওরা তার ঠিক আগেই দীনদয়ালকে লক্ষ্য করে বলেচে :—

কালে কালে সব গেল কাল কাল রাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হোল ফার্সি পড়ে তাঁতি
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মলো শল্য সেনাপতি
আজব শহরে যথা শৃগাল ভূপতি!
তেলাপোকা হোল পাখী শিখী ছাতারিয়া
অর্ব্বাচীন দীনু নাচে তাধিয়া তাধিয়া

সে কথার ও-রকমের শ্রদ্ধাপূর্ণ-উত্তর ওরা আশা করেনি। গোপেশ্বরকে কি ইঙ্গিত করলে নবাই ঠাকুর। গোপেশ্বর সুর বদলালে। দীনদয়াল নামের ওপর ওরা খুব কায়দা দেখালে।

কোথা ওহে দীননাথ, দীন দয়াময়
দীনহীনে দিন দিন হওহে সদয়
জায়া কায়া মায়া লয়ে মত্ত হয়ে রই
দিনান্তে তোমার নাম প্রাণান্তে না লই।

মিথ্যা কথা জুয়াচুরি করি কদাচার
রাগ দ্বেষ অভিমান অর্থ অলঙ্কার
এ সকল মহাপাপে ডুবি সর্ব্বক্ষণ
কি হবে আমার গতি পতিত পাবন ?

উভয় দল এক হয়ে আসরের মধ্যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়ে দিলে। শ্যামরায়ের পুজারী বৃদ্ধ মাধব পণ্ডিত দীনদয়াল্লের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। কানাইহাটির বড় বাবু গরদের জোড় বখ্‌শিস্‌ করলেন দীনদয়ালকে। দীনদয়ালের মধ্যে নতুন ভক্তির, ভাবের বীজ তখন সবে অংকুরিত হয়েছে। প্রৌঢ় নবাই সে-পথে কখনো হাঁটে নি, কাজেই দীনদয়ালের গান আসরের সকলের প্রাণে রসের ছোঁয়া দিয়ে গেল।

কিন্তু আজও একটা কথা দীনদয়ালের মনে হয়।

ধন্য নবাই ঠাকুর !

নিজেকে হঠাৎ সামলে নিয়ে নবাই ঠাকুর যখন ভক্তির 'ছড়া' কাট্‌তে শুরু করে দিলেন, তখন সে কি চমৎকার উজ্জ্বল অনুপ্রাসের ঘটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত খেলিয়ে নিয়ে বেড়াল আসরে।

পাচভূতে সুগঠিত দেহ নবদ্বার
কোন্ মন্ত্রে ছাড়াইব ভূত আপনার
মন্ত্র তন্ত্র জল পড়া এ ভূতে না মানে
নিজমূর্ত্তি ধরি ভূত পঞ্চভূতে টানে।
ভূতের জ্বালায় ভূতে সদা জ্বালাতন
কি হবে আমার গতি পতিত পাবন ?

শেষ রাত্রে আসর ভাঙলো। উভয় দল এমন গান জমিয়েছিল যে শ্রোতার দল উঠতে চায় না, আরো হোক, আরো চলুক, রাত ভোর হয়ে যাক, এমন সঙ্গীতমধু আর কখনো কেউ পান করায়নি এদের, রসের নেশায় ভাবের নেশায় এরাও উন্মত্ত হয়ে উঠেচে যেন, যেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন বেরিয়েচে রাজপথে, আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেচে

ভগবানের নামের অপূর্ব্ব মহিমায়। নভোচারীর বায়ুপথ ত্যাগ করে গীতরস এসেচে নেমে মৃত্তিকার বন্ধুর পথ রেখায়।

দীনদয়াল বাসায় এলেন। রাত আর নেই বল্লেই হয়। তামাক সেজে দাঁড়িয়ে আছে দলের ভৃত্য বিনু নাপিত। এমন সময় কে সম্ভ্রমের স্বরে বলে উঠলো—"নবাই ঠাকুর আসচেন"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন দীনদয়াল। একটু পরে নবাই ঠাকুর ঘরে ঢুকে দুহাত জোড় করে নমস্কার করে বল্লেন—"চক্কত্তি মশায়, আজ আপনি আমাকে জ্ঞান দিলেন—"

সম্ভ্রান্ত, খ্যাতিমান, অবস্থাপন্ন, প্রৌঢ় কবিওয়ালা নবাই ঠাকুরের সামনে দীনদয়াল বিনয়ে, সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। জিব কেটে বল্লেন—"ও কথা বলবেন না, হাত জোড করচি, ওতে আমাকে লজ্জা দেওযা হয।"

—"আপনি ব্রাহ্মণ, হাত জোড করবেন না আমার সামনে। ওতে আমার অপরাধ হয়—"

—"বসুন দয়া করে।"

—"এই বসলাম। বড্ড খুশি হয়েছি আজ আপনার—"

—"একটা অনুরোধ।"

—"কি ?"

—"আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনি বয়সে আমার পিতৃব্যের সমান।"

"বাড়ি কোথায় তোমার ?"

—"ডুমুরদ', হুগলী জেলা।"

—"তুমি নাম করবে বাবাজী। বয়েস হয়েচে আমার, অনেক দেখেচি, অনেক বলেচি। তুমি যে-জ্ঞান আমায় দিলে আজ এমন কখনো পাই নি। আণ্টুনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে আসরে উতোর গেয়েছি, ভোলা ময়রার সঙ্গে উতোর গেয়েছি, হরু ঠাকুরকে দেখেছি, গদাধর চক্কত্তিকে নাকাল করেছি শান্তিপুরের ফুলদোলের আসরে। কিন্তু হ্যাঁ বাবা, আমি স্বীকার করছি আজ হেরে গেলাম তোমার কাছে। তুমি নতুন সুর এনে দিয়েচ কবিগানের মধ্যে। আমরা

পুরোণো ঘুঘু। ছাইতে না জানি, পোড় চিনি। তোমার যে ক্ষমতা, তাতে অনেক বেশি নাম করবে তুমি। নতুন স্থর শোনালে আজ সবাইকে। ভগবানের কাছে কামনা করি, দেশের নাম উজ্জল কর। কেউ বোঝে না বাবা, আসল জিনিস ক'জন বোঝে? রঙ্গ-রস শুনতে আসে সবাই, কবিত্ব যে কি অমৃত, এর মধ্যে যে কি আনন্দ, একটা অনুষ্ঠান ভালমত লাগাতে পারলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হয়, পুত্র-শোক ভুলিয়ে দেয় বাবা, পুত্র শোক ভুলিয়ে দেয়, সে-সব বাইরের লোক কি বুঝবে? তুমি বুঝবে। তোমার মধ্যে সে জিনিস রয়েচে দেখলাম। আব দেখেছিলাম রাসু নৃসিংহকে, ফিরিঙ্গি হোক আণ্ট্নি, হাঁ, ভাষা বুঝতো বটে, রস চিনতো বাবা। তা সেসব—"

দীনদয়াল নবাই ঠাকুরকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। নিজেকে প্রৌঢ়, অভিজ্ঞ কবিওয়ালার ছাত্র বলে বিনয়-প্রণাম করলেন। বিদায় নেবায় সময় সেদিন দুপুরে, নবাই ঠাকুরের চোখে জল এল।

নবাই এর পরে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কোনো আসরে দীনদয়াল আর তাঁর সঙ্গে কবিগানে গাইতে নামেন নি।

কি দিনই গিয়েচে সেসব!……

সন্ধ্যা হয়ে এল কি?

দীনদয়াল ডাকতে লাগলেন, "বাবা রামু—"

কিন্তু গলা দিয়ে স্থর বেরুলো না।

দেবীপ্রসাদ কাছে এসে বল্লে—"বাবা, কষ্ট হচ্চে?" দীনদয়াল ঘাড় নেড়ে জানাতে গেলেন কষ্ট নেই, কিন্তু ঘাড় নড়লো না শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বড় ছেলের মুখের দিকে। দেবীপ্রসাদের চোখে জল পড়তে দেখে বল্লেন, "কাঁদছ কেন বাবা, আমি বড় আনন্দে আছি, কোনো কষ্ট নেই আমার। কেঁদো না।"

দীনদয়াল ভাবলেন তিনি কথাগুলো বল্লেন ছেলেকে, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়ে গেল কথা, গলা দিয়ে স্থরের আধার বার হয়ে এল না।

দেবীপ্রসাদ বুঝতে না পেরে বল্লে, "জল খাবেন বাবা?"

নরহরি জোয়ার্দ্দার পেছন থেকে বল্লেন, "হুঁ। জল খেতে চাইচেন। কুসী করে গঙ্গাজল মুখে দাও।"

বিরক্ত হলেন দীনদয়াল। না, জল তিনি চাইচেন না। তাঁর মনে চমৎকার দুটি অনুপ্রাসবহুল পংক্তি এসেচে, কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদকে সে-দুটি পংক্তি লিখে নিতে বলছিলেন। ওই ছেলেটি তাঁর নাম রাখতে পারে। জিনিষ আছে ওর ভেতরে। তিনি লক্ষ্য করেচেন এটা মাঝে মাঝে। মাতুল বংশের স্থূল-বৈষয়িকতার ধারা হয়তো এই ছেলেটি কাটিয়ে উঠতে পারে।

পরম পুরুষ প্রভো নিত্য সনাতন
চিন্ময় তোমার নাম চিনে কোনজন
আমি দীন জ্ঞানহীন না চিনি তোমারে
কেমনে হব পার, মায়া পারাবারে

না, কেউ লিখে নিলে না। কেউ বুঝতে পারলে না। আর এই নরহরি জোয়ার্দ্দারটা এখানে এসে জুটেচে যে কেন? ওটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বৈষয়িক, ওকে তিনি খুব ভালোই জানেন। প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করা, মাথট আদায় করা, পার্ব্বনী আদায় করা, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, জুয়োচ্চুরি বাটপাড়ি ওর পেশা। ও কি বুঝবে তিনি কি চান? ও কি বুঝবে নবাই ঠাকুর, আণ্টুনি সাহেব, ভোলা ময়রার কবিগানের মাধুর্য্য, বাহাদুরি, কৌশল, ঔজ্জ্বল্য?

না, বড় সুখে ও আনন্দে কেটেছিল সেসব দিন।

নতুন যৌবন দেহের, নতুন যৌবন মনের ও প্রাণের।

দিন রাত আকাশে-বাতাসে কিসের উন্মাদনা। এই কবিতা আসচে মাথায়, এই লিখে নিচ্চেন, আবার কবিতা এসে গেল মাথায়। কী পীড়ন করেচে তাঁর কবিতার নেশা! ঘুমুতে দিত না, খেতে দিত না, শুতে দিত না। রাত-দুপুরে মাথায় কয়েকটি পংক্তি এসে গিয়েচে, আর ঘুম নেই, উঠে তখুনি লিখতে বসে গেলেন।

একটা দিন মনে পড়লো। দিনহাটার বারোয়ারিতে কীর্ত্তনওয়ালী বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ হোল। বিনোদিনী ওঁর কবিগান শুনে মুগ্ধ হয়ে

ওঁকে ডেকে পাঠালে। বিনোদিনী সেকালের খুব নাম-করা কীর্ত্তনগায়িকা। দীনদয়াল গেলেন ওর বাসায়। খুব সুন্দর সে, বয়েস তখন ত্রিশ-বত্রিশ—দীন-দয়ালের সমবয়সী। একগাল হেসে এগিয়ে এল পৈঁছে বাজু বাজিয়ে, জলতরঙ্গ মলের বাজনায় ঢেউ তুলে।

দীনদয়াল বল্লেন—"কি জন্যে তলব পড়েছে?"

বিনোদিনী বল্লে—"আমাব কি ভাগ্যি! মেঘ না চাইতে জল! আসুন, ঠাকুর মশাই আসুন।"

দিনদয়াল বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন তার সামনা-সামনি এসে হঠাৎ বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মুখে বল্লেন—"কেন তলব পড়েচে?"

—"আমি কি ভাগ্যি করেছিলাম, আমাব ঘরে আপনার মত লোক?"

—"আমার ভাগ্যিই কি কম? আমি কার কাছে এসেছি আজ?"

তারপর দুজনে মিলে সুর ও কবিতার চর্চ্চা হলো কতরাত পর্য্যন্ত। দুজন দুজনেব গুণে মুগ্ধ, দুজনেই গুণী শিল্পী। গভীর রাতে দীনদয়াল বিদায় নিলেন, কিন্তু একটা প্রেমের কথা বলবার জন্যে বিনোদিনী কত আনচান করেছিল, দীনদয়াল বুঝেছিলেনও তা, সুযোগ দেন নি। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বন্ধুত্ব তিনি অন্য পথে গিয়ে নষ্ট করতে চাননি।

ভোর হতে না হতে বিনোদিনীর ঝি এসে হাজির। বল্লে, "আপনাকে একটু ডেকেচেন, একটু বেলা হোলে স্নান করে নিয়ে চলুন।"

—"স্নান করে কেন? তোমার মনিব কি দীক্ষা নেবেন নাকি?"

—"আপনি পায়ের ধুলো তো দ্যান কিরপা করে। আমি কি জানি?"

দীনদয়াল স্নান করে পরিষ্কার আনকোরা কাপড় পরে ও চাদর গায়ে দিয়ে চটি পায়ে বিনোদিনীর বাসায় গিয়ে পৌছুলেন। গিয়ে দেখেন বিনোদিনীও স্নান করেচে, ভিজে চুলের লম্বা গোছা গেরো বেঁধে পিঠে ছড়িয়ে ফেলেচে, গরদের লালপাড় শাড়ী পরেচে। কুশাসন পাতা, কলার পাতে ফল ও মিষ্টি জলখাবার সাজানো, ঝকঝকে মাজা কাঁসার ঘটিতে জল বা চিনির পানা, মুখকাটা কচি ডাব-বসানো পাথরের খোরা। দীনদয়াল গিয়ে দাঁড়াতেই বিনোদিনী

সামনে লুটিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লে, "একটু জলসেবা করতে হবে এখানে আজ।"

দীনদয়াল হেসে বল্লেন—"আমি তো খাইনে কারো বাড়ি, তবে তোমার এখানে খাবো। তুমি সাধারণ মেয়েমানুষ নও।"

—"আমি আপনাদের শ্রীচরণের দাসী।"

—"অত বিনয় দেখানো ভালো নয়। কি আছে দাও খাই।"

—"আমি প্রসাদ পাবো কিন্তু। মনে রাখবেন।"

—"দেখি পেটুক ব্রাহ্মণের পাতে কি থাকে।"

খাওয়ানোও তেমনি খাওয়ানো। কত কি ফলমুল, দু-রকমের চিনির পানা, ক্ষীরের মণ্ডা, ছানার মণ্ডা। যেমন বিনয় তেমনি আদর-যত্ন। হাত জোড় করে বল্লে, "আপনি যে গুণীলোক। দশ হাজার লোকের মধ্যে একটা গুণী লোক মেলে। আপনার সেবা করে ধন্য হোলাম, ঠাকুর।"

একটা পর্দ্দা যেন সরে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে।

এতকাল পরেও বিনোদিনীর সেই বাসা সেই জলপানের থালা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। লালপাড় গরদের শাড়িপরা বিনোদিনী হাসিমুখে নতনেত্রে সামনে বসে।

বিনোদিনী বলচে—"কি ঠাকুর, সবগুলো খেতে হবে। ফেললে চলবে না, আপনি যে গুণী লোক, আপনাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই।"

—"সত্যি?"

—"সত্যি না তো কি মিথ্যে ঠাকুর? খান খান।"

দীনদয়াল কি বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় কি একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙলো। চার-পাঁচজন লোক একমনে কথা বলচে। ওরা সামনে এসে দাঁড়ালো। সব ক'জনকে চিনলেন না, তবে ওদের মধ্যে একজন হোল বর্দ্ধমান কাছারীর ডিহিনবিশ কাসেমালি মল্লিক। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ওদের কথাবার্ত্তা থেকে, কাসেমালি মল্লিক কোন্ ভালো কবিরাজ এনেচে পাল্‌কি করে। এখুনি দেখতে আসবেন তিনি।

কাসেমালি বলচে—"এই মাত্র খবর শুনলাম। সবগুলো কাছারিতে আজ গাঁতি জমার বিলির দিন। ঘোড়া করে ফিরতে বেলা দু'পহর হয়ে গেল। নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি, শুনলাম চক্কত্তি মশায়কে ডুমুরদ'র ঘাটে অন্তর্জলি করতে নিয়ে গিয়েচে কাল রাত্তিরে। বল্লবো কি, শুনে মনটার মধ্যে কেমন করে উঠলো। আর থাকতে পারলাম না। চক্কত্তি মশায় গেলে এদিগরের ইন্দ্রপাত হয়ে যাবে যে! অমন গান কে বাঁধবে, অমন শিবের কুচুনি-পাড়া যাওয়ার পাঁচালী কে গাইবে? অমন অনুপ্রাসের ঘটা আর শুনবো না। আহা হা! এখনো মনে আছে, গেয়েছিলেন ষষ্ঠীতলার বারোয়ারির আসরে—

পঞ্চভূত মন্ত্রপূত ভূত বিশ্বময়
ভূতে ভূতে ভূতোনন্দী, ভূত বিশ্বময়

আহা হা।...বলি রামজয় কবিরাজ মশাইকে ডেকে এখনি আমাকে ডুমুরদ'র ঘাটে যেতে হচ্চে—তখুনি পাইক পাঠিয়ে দিলাম—

কাসেমালি ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলো—"ও চক্কত্তি মশাই? কেমন আছেন? চিনতে পারেন আমাকে?"

দীনদয়ালের মনে একটা প্রেমের ও ভাবের ঢেউ এল, তিনি কাসেমালি মল্লিককে খুব আপ্যায়িত করবেন ভাবলেন, বললেন,—"এসো বাবা এসো! কেন কষ্ট করে কবিরাজ আনতে গেলে বাবা? আমি তো বেশ ভাল আছি। বোসো, বাবা।"

কিন্তু কাসেমালি কি তাঁর কথা শুনতে পেলে না? লোকজনের দিকে চেয়ে বল্লে, "আহা, লোক চিনতে পারচেন না। কথাও বলতে পারচেন না। গলার সুরে অনুপ্রাসের মুক্তো বর্ষে গিয়েচে, আজ তাঁর গলার সুর বন্ধ। আল্লার মরজি!" তারপর কবিরাজ এসে বসলো মাথার শিয়রে। দেখে শুনে বল্লে, "সূচিকাভরণ দেবো। আহা, কি লোক! অমন লোক আর হবে না!"

দীনদয়াল দেখলেন,—কাসেমালি মল্লিক উড়ুনির খুঁটে চোখের জল মুছলে।

কাসেমালি বলচে—"কবিরাজ মশাই, দেবীপ্রসাদ আর তার ভাই ছেলে-

মানুষ। এরা কিছু বোঝে না। স্থচিকাভবণ দিতে হয়, যা করতে হয় আপনি করুন। যা খরচ হয় আমি দেবো। ওদেব মত নেবাব দরকার নেই। ওরা ছেলেমানুষ। কি বোঝে ?"

দীনদয়াল মুখে বলতে গেলেন ভাবেব আবেগে, "বাবা কাসেমালি, এই তো আমাব স্থচিকাভবণ। তোমাদেব সকলের ভালবাসাই আমার সব চেয়ে বড স্থচিকাভরণ বাবা। বেঁচে থাকো, আশীর্ব্বাদ করি, উন্নতি করো, ধর্ম্মে মতি হোক। আমাব দেবু রামু যা, তুমিও তাই। আমাব আব স্থচিকাভবণে দরকার নেই, বাবা।"

আবার দেখলেন, বিনোদিনী সামনে বসে হাসি-হাসিমুখে বলচে,—"আপনি যে গুণী লোক ঠাকুব। আপনার সেবা করে ধন্য হই। খান, খান।"

দীনদয়াল বিনোদিনীকে বল্লেন—"ছাখো, কি চমৎকার ছেলেটি। নিজেব খরচে আমাকে স্থচিকাভবণ দিতে কবিরাজ ডেকে এনেচে। ভালবাসার স্থচিকাভবণ দিযে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে তোমবা সবাই। নবাই ঠাকুবকে একদিন এই ওষুধে আমি বশ করেছিলাম, ও বিনোদিনী, মনে পড়ে ?"

বিনোদিনী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো বালিকাব মত।

একটু পবে দেবীপ্রসাদ রামপ্রসাদ দুই ভাইয়ে মিলে বাবাকে নাম শোনাতে আবম্ভ কবলো—"ওঁ গঙ্গা নাবায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নাবাযণ ব্রহ্ম।"

নবহবি জোয়ার্দ্দার বলে উঠলো—"ধবাধবি করে গঙ্গার জলে নিয়ে চলো বাবা, আমি ধরচি একদিকে। শিবচক্ষু।"

সবাই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বোতাম

আজকার ব্যাপারটি যা ঘটলো, তা আমার পক্ষে বেশ একটু আশ্চর্য্যজনক।

সাধারণতঃ জীবনে এমন ঘটনা বেশী ঘটে না।

সেদিন বেলা দশটার সময় ছোকরার দল আমাকে এসে ধরলে, আদিবাসীদের নেত্রী এলিশাবা কুই আজ জেল থেকে মুক্তি পাবেন (কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করার পরদিনই প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এলিশাবা কুইকে মুক্তি দেওয়াই তাঁদের সর্ব্বপ্রথম কাজ, এ-সংবাদ খবরের কাগজ মারফৎ বিহারের অনেকেই অবগত আছেন) সেজন্যে আমাকে মোটরটা দিতে হবে।

আমি জানতাম না এলিশাবা কুই রাঁচি জেলে আছেন। সানন্দে সম্মতি দিলাম, কিন্তু ওরাই যখন বেলা দুটোর সময় আমার কাছে এসে জানালে এবার মোটর দিতে হবে, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো ড্রাইভার ছুটি চাওয়াতে তাকে ভুলে ছুটি দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং নিজেই মোটর চালিয়ে নিয়ে গেলাম জেলের ফটকে। বেলা দুটো বেজে দশমিনিটের সময় এলিশাবা কুই জেলারের সঙ্গে গেটে এসে দাঁড়ালেন। খুব বেশি ভিড় না হলেও খুব কম লোক যে এসেছিল তাও নয়। গণ্যমান্য লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন, দুতিনটি এম-এল-এ, বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা হরজীবন পাঠক, ধনী ব্যবসায়ী নেমিচাঁদ, বাঙালী বড় উকীল প্রভাত রায়, তাঁর জামাই ডাক্তার নীহার মিত্র ইত্যাদি। জনতা এগিয়ে গেল, এলিশাবা কুই-এর গলায় মালা দিয়ে তাকে আমার মোটরে নিয়ে এসে ওঠালে। একটু পরেই আমি মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমার বাড়ি হিণু ময়দানের কাছে, জগন্নাথপুরের রাস্তার খানিক এদিকে। জেল থেকে অনেকখানি চলে এলাম মোটর হাঁকিয়ে, সঙ্গে কেবল হরজীবন পাঠক ও দুটি ছোকরা কংগ্রেস-কর্ম্মী।

ওরা বল্লে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

বল্লাম—গরীবের বাড়িতে মাননীয়া নেত্রীর জন্যে ও আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের জোগাড় করেছি—

একটি ছোকরা বল্লে—উনি তো চা খান না।

হেসে বল্লাম—জল খাবেন না হয় দয়া করে।

পেছনের সিটে দেশনেত্রীর মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

যাঁরা দেশনেত্রী এলিশাবা কুই-এর কথা শোনেন নি বা ভালো জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে দু-একটা কথা ওঁর সম্বন্ধে বলি।

এলিশাবা কুই রাঁচি ও সিংভূমের বন্য আদিবাসীদের নেত্রী। বাংলাদেশ বা অন্যস্থানে এঁর নাম তত কেউ হয়তো শোনেনি, কারণ বিহারের অনেক বিষয়েই বাংলার পাঠক উদাসীন। কিন্তু রাঁচী বা সিংভূম জেলার অধিবাসীদের কাছে এলিশাবা কুই-এর নাম ইন্দ্রজালের কাজ করে।

গত ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় লোহারডগা থেকে যশপুর ষ্টেটের সীমানা পর্য্যন্ত পালামৌ জেলার সমগ্র বন্য অঞ্চলে দুমাস-কাল একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাত সেখানে অচল ও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়েছিল—প্রত্যেকটি থানা, প্রত্যেকটি ডাকবাংলো, প্রত্যেকটি ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস এই স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের কাছারী, থানা ও কর্ম্মচারীদের থাকবার স্থানে পরিণত হয়েছিল। এই স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের নেত্রী ছিলেন এলিশাবা কুই।

লোহারডগা থেকে বুন্‌জীগড় হয়ে যে বাস ঝার্সাগুডা ও সম্বলপুর যায়, তিনমাসকাল তাদের লাইসেন্স-পত্রে সই নিতে হয়েছিল এই স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কাছেই। এই তিনমাস একটি চুরি হয়নি এ অঞ্চলে, একটি পয়সা ঘুষ নেয় নি কেউ।

১২ই অগাস্ট লোবরা অভ্রখনির মালিক মিঃ স্পীড্ প্রথমে খবর পান যে বিপ্লবীদল ছ'টা থানা পুড়িয়েচে, টেলিগ্রাফের তার কেটেচে, রাস্তায় ঘাঁটি বসিয়েচে, রাঁচী-লোহারডগা রেলপথ উপড়ে তুলে ফেলেছে, বন্য গ্রামগুলিতে হো বা ওঁরাও মণ্ডলেরা নিজেদের হাতে শাসনভার নিয়েছে, অভ্রখনির আদিবাসী মজুরেরা কাজ বন্ধ করেচে এবং সম্ভবতঃ তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে খুন করে ফেলবে।

এই ব্যাপারের বাকি অংশটুকু আমি মিঃ স্পীডের ম্যানেজার মিঃ শর্ম্মার

কাছে শুনেছিলাম। আমি নিজে রাঁচিতে অনেকদিন থেকে কন্‌ট্রাক্‌টরী ব্যবসা করি, রাঁচী শহরে আমার আপিসও আছে, আমার বাড়ী গাড়ী সবই এই কন্‌ট্রাক্‌টরী ব্যবসার দৌলতে। মিঃ স্পীডের খনিতে আমি মাঝে মাঝে জিনিসপত্র সরবরাহ করেছি, ওদের কোম্পানীর নাম জন স্পীড্ এ্যাণ্ড কোম্পানী—অনেকগুলি অভ্র ও বক্‌সাইট খনির মালিক।

১২ই অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা স্পীডের বাংলোতে খবর এল, বহুলোক জড়ো হয়ে আসচে বাংলো পুড়িয়ে দিতে। সাহেবের স্ত্রী ও দুই মেয়েও সে সময় বাংলোতে ছিল। রাত্রে বহু চেষ্টা করেও পালানোর ব্যবস্থা করা গেল না। সকালবেলা একটা লরি জোগাড় করে ওরা মালপত্র ওঠাচ্চে—আধঘণ্টার মধ্যেই লরি ছেড়ে কন্‌জিগড়ের পথে ওরা ঝারসাগুড়া বা সম্বলপুরে পালাবে। এমন সময় দুজন একখানা মোটরে এসে নামলো—একজন সাহেবের হাতে একখানা চিঠি দিলে তাতে কড়া হুকুম দেওয়া হয়েচে সাহেবকে, সে যেন স্থানত্যাগ করার চেষ্টা না করে, করলে বিপদে পড়বে পথে। যেখানে আছে সেখানে থাকলে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে, এর দায়িত্ব নিচ্চে প্যালামৌ কংগ্রেস সরকার। চিঠিতে সই আছে এলিশাবা কুই-এর।

লোকদুটি চিঠি দিয়েই মোটরে উঠে চলে গেল।

সাহেব ভয় পেয়ে লরি থেকে মালপত্র নামাতে লাগলো। যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মেম সাহেব কাঁদতে লাগলো। বড় মেয়েটি একটি রিভলবার নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইল।

ঠিক এই সময়ে মিঃ শর্ম্মা আর একখানা লরি নিয়ে সেখানে হাজির। তিনি পাথরবাসা থেকে এই লরিখানা অনেক কষ্টে জোগাড় করে এনেছিলেন সাহেবদের যাওয়ার সুবিধের জন্যে।

মিঃ শর্ম্মা অবাক হয়ে বল্লেন—একি, মালপত্র নামাচ্চেন কেন? যাবেন না?

বড় মেয়েটি রাগের স্বরে বল্লে—**Oh, these black curs! do you know what they have been up to?**

—কি?

—**Ask daddy—I am here to shoot them like pigs if they dare show their black faces.—**

—ঠাণ্ডা হও মিসি বাবা। তোমার বাবা কই? দাঁড়াও আগে শুনি—

মিঃ স্পীড বাইরে এসে হাতের চিঠিখানা নেড়ে বল্লে—**Hallo Sharma, see this? these black congress devils are at their dirty tricks even here—**

—দেখি কি ব্যাপার?

—**And see how ungrateful these black dogs are, we teach them, we make them what they are, we give them our Gospels and—see this black woman with a funny name from the Old Testament intimidating me as if she is the—**

মিঃ শর্ম্মা চিঠি পড়ে হেসে বল্লেন—এরা তো ভালোই বলচে। এলিশাবা কুই আদিবাসীদের নেত্রী। সেবার রামগড় কংগ্রেসে দেখেছিলাম। বেশ সুন্দর চেহারা। আদিবাসী হো, ওঁরাও, মুণ্ডা ও কোলেরা এঁকে বড্ড মানে। উনি ওদের জন্যে গ্রামে গ্রামে স্কুল করেচেন—হাতের কাজ শেখাচ্চেন—

—আর আমরা করিনি?

—করবে না কেন সাহেব, তোমরাও, মানে তোমাদের মিশনারীরা, অনেক কিছু করেচে এদের জন্যে। কিন্তু একটা দোষ তোমরা করেচ বা মিশনারীরা করেচে—সেটা হচ্চে, তাদের নিজের জাতি বা নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাবও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেচ তাদের মনে।

—তার মধ্যে খারাপ কি আছে? ভূতপূজো গাছপূজো ছাড়িয়ে আমরা ভাল করেচি না খারাপ করেছি? কি বলতে চাও তুমি?

—তারা বড় শালগাছ দেখে তার তলায় মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ অরণ্য দেবতার পূজো করে—বড় পাহাড় দেখে তার তলায় জিয়াং বোঙ্গা অর্থাৎ পর্ব্বত দেবতার—

—ফেটিশ ওয়ারশিপ্—

—তোমার আমার পূর্ব্বপুরুষও একদিন ফেটিশ ওয়ারশিপ করতে ছাড়ে নি—বেদে তার প্রমাণ আছে—তোমাদেরও পুরোনো দিনের ধর্ম্মের মধ্যে তার প্রমাণ আছে সাহেব—ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন কি করতে চাও বলো—

—লরি রওনা করবো। কি করবে কংগ্রেস কুকুরেরা ?

সাহেবের কথা শেষ না হতে একখানা লরি এসে দাঁড়ালো বাংলোর সামনে। লোক-বোঝাই লরি, কংগ্রেসের পতাকা উড়ছে, জন-ত্রিশেক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ফটক ঠেলে। মুখে তাদেব 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ' ধ্বনি। সাহেব ও মিঃ শর্ম্মার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। এবার এরা বোধ হয় সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু গাড়ি থেকে দলের পুরোভাগে নেমে এল একটি ছিপ্‌ছিপে কালো তরুণী, খদ্দরের শাড়ি পরণে। খালি পা, হাতে একখানা বাঁধানো মোটা খাতা। তরুণীটিকে দেখেই বোঝা যায় সে হো বা মুণ্ডা জাতের মেয়ে। কিন্তু মুখখানা ও চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

মেয়েটি এসেই ইংরিজিতে সাহেবকে বল্লে—তুমিই মিঃ স্পীড্ ? অভ্রখনির মালিক ?

—হ্যাঁ।

—কোন ভয় নেই। এখানে নির্ভয়ে থাকো। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে না। পথে অনেক ভয়। তোমাদের মেরে ফেললে তার দায়ী হবে না আমার গবর্ণমেণ্ট।

—তুমি কে জানতে পারি কি ?

—আমি স্বাধীন প্যালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট। আমার নাম এলিশাবা কুই। ইস্তাহারে আমারই নাম আছে। পথে বেরুলে যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তার জন্য আমার গবর্ণমেণ্ট দায়ী হবে না বলে রাখছি। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলচি। শোনো না শোনো তোমাদের খুশি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেম সাহেব ও তাদের মেয়েরা এই ব্যাপার দেখছিল। ওরা যখন মোটরে উঠে চলে গেল, তখন সাহেবের বড় মেয়ে ঠোঁট উল্‌টে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বল্লে—ফু! মাই গবর্ণমেণ্ট।

সাহেব বল্লে, **I ought to talk to this bully, ram into her stupid noddle that she is a blockhead and a fool—**

মিঃ শর্ম্মা চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সাহেবদের কথা তাঁর ভালো লাগচে না। তিনি সবিনয়ে বুঝিয়ে বল্লেন এখন বাংলো ছেড়ে পথে না বেরুলেই ভালো হবে। সত্যিই এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়েচে। তিনি তার অনেক লক্ষণ দেখেচেন রাস্তায় ঘাটে। সাহেব বল্লে—এখানে থাকলে কিছু হবে না?

—আমার তাই মনে হয়।

—ওদের কথায় বিশ্বাস কি?

—আমার মনে হয় ওদের কথায় বিশ্বাস করা যেতে পাবে।

—আমাদের সঙ্গে তুমিও থাকবে এখানে?

—যদি বলেন, থাকবো।

—পাথরবাসাতে কত টাকা মজুত?

—ন' হাজারের ওপর। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। পথ-ঘাট বন্ধ।

—টাকা এখানে নিয়ে এসো। চারটা বন্দুক এখানে।

—আনতে ভয় হয়। পথে টাকা নিয়ে বেরুতে পারবো না। সাত মাইল রাস্তা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

—চলো আমি যাচ্ছি বন্দুক নিয়ে। টাকা আজই নিয়ে আসি।

—না সাহেব। তাতে বিপদ বেশি। আমি একা যাই। লোকজন কেউ কাজ করতে চাইচে না। প্রায় সবই তো পালিয়েচে। যারা আছে তাদেরও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

মিঃ শর্ম্মা পাথরবাসা খনিতে চলে যাবার পরে দুদিন কেটে গেল, সাহেব

চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাপার কি, ম্যানেজার টাকা নিয়ে ভাগলো নাকি ?

মেম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে সাহেব বন্দুক নিয়ে নিজেই লরি চালিয়ে বেরিয়ে গেল—তিন মাইল দুর গিয়ে জঙ্গলের প থ দেখলে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। মিঃ শর্ম্মা হেঁটে আসছেন, সঙ্গে একজন লোক তাঁর সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসচে, তাঁর চারিধার ঘিরে সাত আট জন কংগ্রেসী পুলিশ। সাহেব লরি থামিয়ে দিলে দলের সামনে। জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার মিঃ শর্ম্মা ?

মিঃ শর্ম্মার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটচেন। তিনি যা বল্লেন তার ভাবার্থ এই যে পাথরবাসার কুলিদের সর্দ্দার তাঁকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তারা বলে, সাদা ভূতের রাজত্ব শেষ হয়েচে। ওদের টাকা এখন আমাদের। নাও টাকা কেড়ে। শেষকরে দাও এ কুকুরটাকে।

মিঃ শর্ম্মা ধ্বস্তাধস্তি করতে গিয়ে হাতে পায়ে আঘাত পান। মারাই পড়তেন, ঠিক এই সময় এঁরা এসে পড়েন। তাই—

সাহেব বল্লে—এরা কে ?

ওদের মধ্যে একজন সাহেবকে উত্তর দিলে—কংগ্রেস বিদ্যুৎ-বাহিনীর লোক—

আর একজন বল্লে—আমাদের এলাকার মধ্যে কোনো অরাজকতা হতে দেবো না—

সাহেব বল্লে—টাকা ঠিক আছে মিঃ শর্ম্মা ?

—পাই পয়সা।

মিঃ শর্ম্মা খুব ভালো আর প্রভুভক্ত লোক। সাহেব তাঁকে বিশ্বাসও করতো যথেষ্ট, কিন্তু এসময় শুধু বিশ্বাস নয়, ওঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছিল সাহেবকে। কোনো দিক থেকে একটা আলু কি এক ছটাক চালও যোগাড় করা সম্ভব হোত না মিঃ শর্ম্মার সাহায্য ছাড়া। সমস্ত জনমজুর চলে গেল, মোটরের ড্রাইভার চলে গেল, মেম সাহেব ও তার দুই মেয়ে নিজেরা বড় বড়

তিনটে মুলতানী গরুকে বিচিলি কেটে খাইয়েচে, নিজেরা দুধ দুয়েচে—নয়তো গরুগুলো ওই ধাক্কাতে না খেয়েই মারা পড়তো।

একমাস। দুমাস।

তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

এলিশাবা কুই ধরা পড়লেন বাগুণ্ডার ঘাটোয়ালী কাছারীতে। দলবল কিছু পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালো, কিছু স্থন্দরগড় স্টেটের অরণ্য-ভূভাগে গা ঢাকা দিলে।

সেই এলিশাবা কুই।

আমার বাংলোর সামনেই মোটর থামিয়ে ওঁকে এবং বাকী সকলকে নামতে অনুরোধ করলাম। কিছু না, সামান্য একটু চা। আমার বাড়িতে অনেকগুলি মেয়ে এসে জুটেছিলেন এলিশাবা কুইকে দেখবার জন্যে। শাঁক বাজলো, হুলু পড়লো, খই ও ফুল ছড়ানো হোল। তারপর মেয়েরা হাত ধরে ওঁকে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

জনৈক কংগ্রেস-কর্ম্মী বল্লেন—বেশিক্ষণ দেবী করতে পারা যাবে না মশাই, পাঁচটায় আমাদের মিটিং আছে—ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

—যত শীগ্‌গির হয় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—একটু বুঝিয়ে বলুন মেয়েদেব—

—এখন যতই বুঝিয়ে বলি ফল হবে না। কিছু সময় যাক—

বাইরের লোকদের চা-পর্ব্ব মিটে গেল। আধঘণ্টা সময় কাটলো। আবাব ওঁরা ধরলেন—আপনি একবার অন্দরে যান মশাই, আমরা আর বিলম্ব করতে পারবো না।

আমারও আর ইচ্ছে নেই দেবি করাবার। বাড়ির সামনে লোকের ভিড যেন ক্রমশঃ জমচে!

আমি অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যকে উদ্দেশ করে হেঁকে বল্লাম—কই, হোল? ইদিকে এঁরা তাড়াতাড়ি করচেন।

কোনো উত্তর নেই।

বহু মহিলাকণ্ঠের সম্মিলিত কলরবে অন্দর সরগরম। কে কার কথা শোনে?

অসহায়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বল্লাম—ইয়ে—এঁরা বড্ড ব্যস্ত হয়েচেন—একটু তাড়াতাড়ি।

ষোলো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে এসে বল্লে—কি বলচেন?

—ওঁকে একটু ডেকে—তুমি কোন্ বাড়ীর মেয়ে চিনতে পারলাম না তো—

—আমি রজনী বাবুর ভাইঝি—

—ও! তুমিই কলেজে পড়ো?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। মাঝে মাঝে এসো। তা ওঁকে একটু ডেকে দিতে হচ্চে—এত দেরি হচ্চে কেন?

—সবাই অটোগ্রাফ নিচ্চে যে। আবার বাণী চাইচে। বিশ পঁচিশটি কলেজের মেয়েই তো এসেচে—ওই আসচেন—

বলেই মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়ালো। এলিশাবা কুই আগে আগে হাসিমুখে, পেছনে নারীবাহিনী। এই আমি প্রথম ভালো করে এলিশাবা কুইকে দেখলাম। এতক্ষণ ব্যস্ততায়, উত্তেজনায় ও ভিড়ে আমি ভাল করে ওঁর মুখ দেখবার সুযোগই পাইনি।

আমি চমকে উঠি। হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে যাই। খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

আমার একেবারে সামনে যখন উনি এসেচেন, তখন আমি বল্লাম হিন্দিতে—দয়া করে আসুন বাইরে। বড় তাড়াতাড়ি করচেন ওঁরা। এলিশাবা কুইয়ের মুখশ্রী অতি সুন্দর। এদেশের আদিবাসিনী বন্য রমণীদের সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও শান্তপেলব লাবণ্যমাখা মুখশ্রী এখনো ওঁর বজায় আছে। উনিও এই সময় আমার দিকে চাইলেন। একটু বেশিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পেছনে মেয়েদের ভিড়। কিছু বলবার সুযোগ হোল না। বাইরে নিয়ে এসে মোটরে ওঠাবার সময় সুযোগ ঘটলো, মিনিট খানেকের জন্যে। বল্লাম—বলিবায় ছিলেন? বলিবার জঙ্গলে?

উনি চমকে উঠলেন! আমার দিকে ভালো করে চাইলেন! ওঁর মুখে বিস্ময় ও সংশয় মাখানো।

বল্লাম—তাহোলে আপনিই সেই। মনে পড়েচে?

উনি আশ্চর্য্য হওয়ার স্বরে বল্লেন—আপনি?

কথা সবই হিন্দিতে।

বল্লাম—চিনেচেন? মনে পড়ে সেই ওভারসিযার নিকোডিম কারকাট্টা?

—হ্যাঁ।

—কাজ সেরে আসুন সন্দে বেলা। কথা কইবো অনেক।

—সেই ভালো।

সবাই ওঁকে নিযে বেরিয়ে চলে গেল। এলিশাবা কুই। এলিশাবা কুই। কি আশ্চর্য্য—শুধু বসে বসে ভাবি। এলিশাবা কুই তো নয়, ওব নাম চম্পু। কি আশ্চর্য্য লাগচে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপাবটা।

কুড়ি বছর আগের কথা।

আমি তখন সবে বছর-দুই হোল ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে পাশ করে ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে বাইরে বেরিয়েছি।

আমার বয়েস বাইশ-তেইশ। 'পি ডবলিউ ডি'র সামান্য চাকরি কবি।

বলিবা থেকে কামারবেড়া পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছিল ঘন সারাণ্ডা অবণ্যেব মধ্যে দিয়ে।

বলিবা একটি বন্য গ্রামের নাম, লোক সংখ্যা হয়তো ছিল পঞ্চাশ কি তেষট্টি, গুণে দেখিনি কখনো। তবে ওই রকমই হবে। গ্রামের সামনে পাহাড়, ডাইনে-বাঁয়েও পাহাড়, পেছনে গভীর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে যে সামান্য সমতল জমি, তাতেই গ্রামের লোকে ভুট্টা, জনার, শকরকন্দ আলু, টক পালং ও টোমাটোর চাষ করে।

আজ বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে বলিবা গ্রামের ছবি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় কর্ম্মস্থল। তারপর এই কুড়ি বছরে কত জায়গা দেখলাম, সামান্য রোড্-

সার্ভেয়ার থেকে এখন আমি একজন ধনী কনট্রাক্টর, কত কি ঘটে গেল জীবনে। কত অসম্ভব সম্ভব হোল। কিন্তু বলিবা গ্রামের কথা, তার সেই মাকা হো'র পেঁপে বাগান, ছোট্ট উমুরিয়া ঝর্ণার কলকল জলস্রোত, বোঙ্গা পূজোর প্রকাণ্ড জগহরি শাল গাছটা, সন্ধ্যাবেলায় মাকা হো'র উঠানের পুরু শালকাঠের পালিশবিহীন, অসমতল বেঞ্চিতে বসে চা-পান ও গল্প কখনো ভুলবো এসব ?

বলিবা গ্রাম প্রথমে আমার বাসস্থান ছিল না। বলিবা-কামারবেড়া রাস্তা জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছিল বন-বিভাগ থেকে। তাঁদের কর্ম্মচারীরা 'পি, ডবলিউ, ডি'র কাছে আমাকে হাওলাত চান রাস্তা করবার সময়। তিন মাসের জন্যে আমাকে হাওলাত দেওয়া মঞ্জুর করা হয়। সেই সূত্রেই আমি যাই এবং এগারো মাইল দূরবর্ত্তী জেরাইকেলা থেকে সাইকেল যোগে এসে রোজ কাজ করতাম। সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গেল। রাস্তা তৈরী আরম্ভ হোল। তবুও আমাকে যেতে হোত, কতখানি হয়েচে সেটা তদারক করতে।

ভীষণ জঙ্গল। বড় বড় গাছ পড়েছিল রাস্তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট জমিতে। কুলিতে গাছ কাটছিল, পাহাড়ের গা কাটছিল রাস্তা বের করতে, বড় বড় পাথরের চাঁই রাস্তায় এসে পড়ছিল, হো কুলি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাথর ও মাটি বইছিল।

সে-জঙ্গলে বুনো হাতী ও বাঘ ঘোরে রাত্রে। আমাদের নতুন তৈরী রাস্তার ওপর বুনোহাতীর পায়ের দাগ। কি বিরাট শাল গাছ এক একটা! দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। কুলি ও কুলিনীরা না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দী—হো ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। খাবার কিছু মেলে না কেবল মকাই আর জনার।

একজন ওভারসিয়ার ছিল হো খৃষ্টান, নাম নিকোডিম কারকাট্টা। লোকটা বনবিভাগের কর্ম্মচারী, রাস্তার কুলিদের কাজ তদারক করতো আর কুলিদের প্রতি কি গালমন্দ, মারধোর করতো! মেয়ে-কুলিদের ওপরও এইরকম করচে দেখে একদিন আমার ভারী রাগ হোল। সে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল,

চাবুক উঁচিয়ে মারতে যায় মেয়েদের, পাথরের ঝুড়ি বইছে মাথায় নিয়ে, দিলে সজোরে ধাক্কা, ঝুড়িসুদ্ধ ছিটকে পড়ে গেল একটি মেয়ে কুলি।

আমি বল্লাম—ও কি হচ্ছে ?

নিকোডিম রেগে উঠে বল্লে—কি ?

—কি দেখতে পাচ্চ না ? মেয়েদের অমন করে ধাক্কা দেয় ? ছিঃ !

—ওরা কাজ করচে না।

—তা বলে তুমি মারবে ওদের ?

যে মেয়েটিকে ধাক্কা মারা হয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়ছিল, নিকোডিমের ভয়ে সবাই সেখানে জুজু, কারো কিছু বলবার সাহস নেই। আমি যখন নিকোডিমকে তিরস্কার করছি, তখন অন্য সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল। আমার বকুনি খেয়ে নিকোডিম সেখান থেকে এগিয়ে পাহাড়ের নীচে রাস্তার ও-বাঁকে চলে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু তখুনি মিটলো না। নিকোডিম সেদিন থেকে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ওসব জঙ্গলের মধ্যে ওদের সাহায্য ভিন্ন খাবার যোগাড় করা মুস্কিল। ও গ্রামে বারণ করে দিলে—আমি দুধ পাইনে, ডিম পাইনে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্যে বলিবা গ্রামে গবর্ণমেণ্টের তৈরী ঘর আছে। সেখান যাতে আমি রাত্রে আশ্রয় না পাই, তার ব্যবস্থাও করলে। ফলে এই দাঁড়ালো কাজ করতে করতে যদি বেলা যেতো, সূয্যি অস্ত যাবার জোগাড় করতো পশ্চিমের বন পাহাড়ের ওপারে—আমায় সাইকেলে ফিরতেই হ'তো বন্যজন্তু-অধ্যুষিত বনপথ ধরে এগারো মাইল দূরবর্ত্তী জেরাইকেলায়। আশ্রয় বা খাদ্য কিছুই মিলতো না নিকটে কোথাও।

আমার ভয় করতো না বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। সাত মাইল দূরে কেরুকোচা নালার ধারে বেলা একদম পড়ে আসতো, অন্ধকার দেখাতো পাহাড়ী ঢালুর ঘন শাল জঙ্গল। বড় বড় আসান গাছগুলো দেখাতো ভূতের মত, শুকনো পাতার শব্দ শুনলে মনে হোত বাঘ বেরিয়েচে, প্রত্যেক বাঁকে মনে হোত আধ-অন্ধকারে বুনো হাতি রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে

আছে—সাইকেলের সঙ্গে তাল লাগাবে বুঝি—তবুও যেতে হয়েচে বাধ্য হয়ে।

একদিন সম্বর হরিণের একটা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর দেখতাম বন-মোরগ ঝট্‌পট্‌ করে সামনের রাস্তার ওপর থেকে উড়ে গেল; দেখতাম ময়ূর রাস্তা পার হয়ে এদিকের বন থেকে ওদিকের বনে যাচ্ছে। দেখতাম দু'-একটা কোৎরা সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কোনো হিংস্র জানোয়ার চোখে পড়েনি।

দিন পনেরো কাটলো।···

দুপুরবেলা একদিন পাহাড়ের নিচে তেপায়ার ওপর টেবিল বসিয়ে জরীপের নক্সা দেখচি, এমন সময়ে কোথা থেকে একখানা পাথর গড়িয়ে এসে পায়ে বিষম চোট লাগলো। দুটো আঙুল ছেঁচে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি দুহাতে পা চেপে ধরে তখুনি বসে পড়লাম—দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না।

কিছুদূরে কুলিরা কাজ করছিল, ওরা ছুটে এল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে আমার পা বেঁধে দিলে। আমি সেখান থেকে উঠতেই পারলাম না, যখন অতিকষ্টে উঠলাম তখন দেখি সাইকেল চালিয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়েছি।

বেলা গেল, সূয্য ঢলে পড়লো বনের ওপারে। সেটা ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতও তেমনি নামলো সেদিন সূর্য্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কুলীর দল তো আর একটু পরেই পালাবে। বনবিভাগের লোকেরা আমাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখে না নিকোডিমের ভয়ে। ওদের তাঁবুতে আমার প্রবেশ নিষেধ। আমি এখন যাই কোথায়?

কুলিরা কাজ শেষ করে দলে দলে পাহাড়ের ওপরের রাস্তা বেয়ে বলিবা গ্রামের দিকে চললো। আমার অবস্থা কি তা অনেকেই জানে না। কাকে বা বোঝাই, কি বা বলি। হো ভাষা তেমন আয়ত্ত করিতে পারিনি, দুএকটি কথা ছাড়া।

এমন সময়ে সেই মেয়ে কুলির দল আমার সামনে দিয়েই নীচে থেকে ওপরে

উঠচে। কাজ করতে করতে ওরা রাস্তার নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। আমার কাছে, যখন দলটি পৌঁচেছে তখন একটা মেয়ে দল ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলাম ওর দিকে, এই মেয়েটিই আমার পায়ে ওর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। আরও আমার মনে হোল নিকোডিম সেদিন একেই ধাক্কা মেরেছিল। যখন ও আমার পায়ে ওর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বাঁধে, তখন যন্ত্রণার চোটে কারো মুখ ভালো করে দেখার অবস্থা ছিল না আমার। তখন চিনিনি।

ও বল্লে—জুম্ পে ?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম বুঝি নে ওকথা। হাত দিয়ে দেখালাম পায়ের ঘা। ওর মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি সাইকেলে উঠতে পারবো না। পায়ে ব্যথা।

এতদিন পরেও একটা কথা আমার মনে আছে, মেয়েটির বড় বড কালো চোখের সে অদ্ভুত স্নেহ ও সহানুভূতি-ভরা চাউনি! সে-চাউনি কখনো ভুলবো না। আমি এদের কাছে আশা করিনি এরকম চাউনি। কেননা বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছিলাম, বন্য জাতিরা মানুষই না, ওসব একরকম কিম্ভূতকিমা-কার জীব—এই ছিল আমার ধারণা ওদের সম্বন্ধে। তাদেরই একটি মেয়েব চোখের চাউনির মধ্যে দিয়ে আমারই মা-বোন উঁকি মাববেন, একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই উঁকি মারবেন—দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার হোত না।

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার চেয়েও বিস্মিত হবার কারণ ঘটলো যখন সে এসে আমার হাত ধরে তুলবার চেষ্টা করে বল্লে—নাকি ওকু দিইসানা, জুম্ পে ?

আমি ঠেলে উঠলাম—দাঁড়ালাম অতি কষ্টে।

কি বলচে মেয়েটি ? কি একটা প্রশ্নের সুর ওর কথায়, কি প্রশ্ন ? ঘাড় নেড়ে বোঝালাম বুঝি না ওর কথা।

তারপর মেয়েটি যা করলে, তা যে কত বিস্ময়কর হয়েছিল তখন আমার কাছে। মেয়েদের কি বল্লে ও। আমার চারিপাশে ঘিরে ওরা দাঁড়ালো এসে।

দুতিনজনে শক্ত করে আমার বগল ও হাত ধরলে। মেয়েটিও ধরেচে ডান হাত। চল্লাম ওদের সঙ্গে। আমাদের পেছনে পেছনে একটি মেয়ে সাইকেলখানা ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো।

জঙ্গলের ধারে বলিবা গ্রামের একটি ঘরে ওরা আমায় নিয়ে এল। পরে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নাম মাকা হো, বলিবা গ্রামের মণ্ডল। শালকাঠের খুঁটি ও আড়া-লাগানো একখানা কুঁড়ে ঘর, না তার জানালা, না দরজা—ঘরের সামনে শালকাঠের তক্তা সোজা করে পুঁতে বেড়া দেওয়া। ওরকম ঘরে কখনো বাস করিনি। তেমনি শীত এখন এই বনের মধ্যেকার গ্রামে। চীহর লতার ছালের দড়ি দিয়ে ছাওয়া একখানা খাটিয়াতে ঘরের চরখা-কাটা মোটা সুতো দিয়ে বোনা একখানা চাদর পেতে দিলে, সতরঞ্চির মত পুরু।

সেই মেয়েটি আমায় শুইয়ে রেখে চলে গেল। সবাই চলে গেল।

আমি একা ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শালকাঠের মোটা মোটা আড়া লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই জন্যে শালকাঠের আড়ার কথা আমার বড় মনে আছে। অসহায় অবস্থায় চুপ করে শুয়ে আছি, দূর এক বন্যগ্রামে, বন্য জাতিদের মধ্যে। কি আমার উপায় হবে এখানে, কি করি এখন, এমন সতেরো হাত জলের তলায় পড়ে যাবো বিদেশে এসে তা কখনো ভাবিনি। ভয়ও হোল, এ ঘরে তো দরজা নেই, নিকটেই বন, গভীর রাত্রে বাঘ ভালুক ঘরে ঢুকবে না তো? প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারেই শুয়ে আছি। বাইরে কিন্তু চাঁদনী রাত, তবে শুক্লপক্ষের প্রথম দিক, জ্যোৎস্নার তেমন জোর নেই। আকাশে মেঘ হওয়ার জন্যেও সেটা হোতে পারে—আমার অতটা মনে নেই।

হঠাৎ দোর দিয়ে কে ঘরে ঢুকলো, কবাটহীন দোর, যে কেউ যেতে আসতে পারে।

চমকে বাংলায় বল্লাম—কে?

মৃদু নারীকণ্ঠে উত্তর এল—চম্পু—

মেয়েটি আমার ভাষা বোঝে নি। কিন্তু আমার প্রশ্নের সুরে স্বভাবতঃই

তার মনে হয়েচে ঘরে কে ঢুকলো ·তাই আমি জিগ্যেস করেছি, সুতরাং সে তার নাম বলেচে।

এই প্রশ্নোত্তরের অভিনবত্বের জন্যেই চম্পু নামটা আমার হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগলো। অনায্য নাম নয় বলেও বোধ হয়। কারণ আমি জানি ও-অঞ্চলে মেয়েদের নামের মধ্যে কমনীয়তা খুঁজতে গেলে বড্ড নিরাশ হতে হবে।

ভাষা জানি নে, সুতরাং চম্পু নামটার ওপরই একটি সম্পূর্ণ বাক্যের জোর দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—চম্পু ?

—হোই।

অর্থাৎ 'হাঁ'।

—খিদে পেয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়ে খাওয়ার অভিনয় করলাম। মেয়েটি হেসে ঘব থেকে বার হয়ে গেল এবং আধঘণ্টাটাক পরে কতকগুলো শকরকন্দ আলুসিদ্ধ শালপাতায় জড়িয়ে নিয়ে এল। চা খাবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে তা বোঝানো আমার দুঃসাধ্য-জ্ঞানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

মেয়েটি তখন চলে গেল। আবার আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকলো, শালকাঠেব আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঘরের ঠিক মাঝখানে। ছোট একখানা তুলোর লেপ আমায় দিয়ে গেল রাত্রে গায়ে দেবার জন্যে।

আমি প্রশ্নের স্বরে বল্লাম—চম্পু ?

একটিমাত্র কথাই জানি, যতক্ষণ এবং যত রকম ভাবে সম্ভব সেই কথার সদ্ব্যবহার করি।

মেয়েটি এবার হেসে ফেল্লে আমার সামনেই। বলে—হোই।

আমার হো ভাষার দৌড় বোধ হয় বুঝতে পেরেচে।

ঘরে আগুন জ্বললে আমি চম্পুকে ভালো করে দেখতে পেলাম। এ সেই মেয়েটি, যাকে নিকোডিম ধাক্কা মেরেছিল। বেশী ওর বয়েস নয়, পনেরো ষোলোর বেশি হবে না, সুন্দর মুখশ্রী। এই বন্য দেশে এমন মেয়ে আছে

জানতাম না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বাংলাদেশের যে কোনো স্কুল কলেজের মেয়ের মত।

একটু পরে মাকা হো ঘরে ঢুকলো। পঞ্চাশ ছাড়িয়েচে বয়েস, এখনো দিব্যি সবল। মাকা হো ঘরে ঢুকেই হিন্দিতে বল্লে—কেমন আছ ?

আমি মহা খুশি হয়ে বল্লাম—বাঁচলাম। হিন্দি জানো দেখচি—

—বাংলা ভি জানে। কিছুটা বুঝচে।

—বাঃ বাঃ—বেঁচে থাকো। নাম কি তোমার ?

—মাকা হো--

—এ গ্রামের নাম কি ?

—বলিবা আছে।

—শোনো মাকা হো, তোমাকে বাংলা শেখাই ভালো করে। এখানে 'আছে' অনাবশ্যক ক্রিয়াপদ। শুধু 'বলিবা' বল্লেই হোল। বুঝলে ? এরপব ওরকম আর বলবে না।

মাকা হো আমার বৈয়াকরণিক আলোচনা বুঝলে না। না বুঝেই বিজ্ঞভাবে ঘাড নাড়তে লাগলো।

হিন্দিতে বল্লাম—চম্পু তোমার মেয়ে ?

—না। ওর কেউ নেই কেবল এক বুড়ী দিদিমা ছাড়া। এ গাঁযে ওদের বাড়িও নয়। করমপদা থেকে এসেচে।

—বড় ভালো মেয়ে।

—সবাই ওকে ভালো বলে।

চম্পু মাকা হোকে কি বল্লে। মাকা আমার দিকে চেয়ে বল্লে—চম্পু বলচে এ গাঁয়ে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে।

—ওকে বলো, এখানে দেখবে কে ?

—চম্পু বলচে, ও দেখবে।

—আমাকে রেঁধে খাওয়াবে ?

—বলচে যা কিছু দরকার সব করবে! শোনো তোমায় বলচে এখন

ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা যাই। কাল সকালে তোমার পায়ে ওষুধ বেটে দেবে বলচে।

—চম্পুকে ধন্যবাদ দিচ্চি। ও আমার বোনের মত।

—ও বলচে, তুমিই ওকে নিকোডিমের হাত থেকে বাঁচিয়েচ।

—বলো, সে আমার কর্ত্তব্য কাজ। করা উচিত তাই করেচি।

—চম্পু বলচে, কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার পা ও সারিয়ে দেবে। তুমি যতদিন সেরে না ওঠো, নির্ভাবনায় এখানে থাকো। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেচ, ওর কর্ত্তব্য ও করবে।

সেই রাত্রিটির কথা আজও ভুলিনি। ওরা চলে গেল। আমি একা শুয়ে রইলাম। নতুন জায়গা, বনের মধ্যে গ্রাম। দরজার কপাট নেই। নানারকম শব্দ বনের মধ্যে সারা রাত, গ্রামের অদূরেই নিবিড় অরণ্য। বন্যকুক্কুটের ডাক শুনচি, কোৎরা ডাকচে, ঘুম আর আমার আসে না। ঘরের পেছনে খস্‌খস্ শব্দ হয়, আমি অমনি চমকে উঠে ভাবি এ বোধ হয় ভালুকের পায়ের শব্দ। গভীর রাত্রে দূরে কোথায় বন্য হস্তীর বৃংহতি কানে গেল। কত রকম ভয়ে যে রাত কাটলো—ঘুমিয়ে পড়লাম একেবারে ভোরবেলা। জেগে উঠে দেখি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়েচে, চম্পু এসে ডেকে উঠিয়েচে, বিছানার পাশেই সে দাঁড়িয়ে, হাতে ওষুধ বাটা।

ও আমার পা বেশ ভাল করে টিপে টিপে দেখলে। একবার জোর করে টিপতে আমি যন্ত্রণায় 'উঃ' করে উঠলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—জুম্ পে ?

পরে জেনেছিলাম এর মানে—পায়ে লাগচে ?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম—ও বুঝি নে।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম মুখ ধোয়ার জল আনতে। চম্পু জল নিয়ে এল। নতুন ওষুধ বাটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিলে এবং একটা জাম বাটিতে কি একটা জিনিস আনলে, শালপাতা দিয়ে ঢাকা।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—কি ওতে ?

—মাস্তি।

—তার মানে বুঝলাম না, দেখি বাটি নিয়ে এসো—

চম্পু আমার ইঙ্গিত বুঝে বাটি নিয়ে এল, ও হরি এক বাটি ভাত! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—মাস্তি?

চম্পু হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। সে আমার ভাষাজ্ঞানের দৌড় বুঝে নিয়েচে। হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বল্লে—হোই। এইভাবে ও আমার মনের ভাব আন্দাজে বুঝে নিত, আমি বুঝে নিতাম ওব।

সেই ঘরে কেটেছিল দশ দিন। চম্পু কি সেবাটাই করেছিল এই দশদিন। ভাষা না বুঝলেও আমি ওর ভালোবাসা বুঝতাম, নয়নেব স্নেহদৃষ্টি বুঝতাম। আমি ওর হাত দুটি ধরে একবার আবেগের মাথায় বলেছিলাম—চিরকাল মনে থাকবে তোমার কথা চম্পু। কখনো ভুলবো না তোমায়।

চম্পু কিছু চায়নি আমার কাছে। যা করেছিল, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবে। এমনি দুর্লভ মন ছিল ওর। আমিও তখন গরীব, তবুও আসবার দিন সাইকেলে উঠবার সময়, ওকে আমার হাতঘড়িটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি। আমার জামার বোতাম দেখিয়ে বল্লে—ওটা নেবে। মাকা হোকে বল্লাম—বুঝিয়ে দাও, এ সোনার নয়, পেতলের ওপর গিল্টি করা। এর দাম ছ'আনা পয়সা। এ নিয়ে কি হবে?

চম্পু শুনলে না, বল্লে—না, বোতাম নেবো।

সরলা হো বালিকা। যা চায় তাই দিলাম, ছ'আনা পয়সার চারটি পেতলের বোতাম। অনেক দিনের কথা হয়ে গেল সে সব। মধ্যে অবস্থা যখন দিনকতক খুবই খারাপ হয়ে গেল, রাস্তার কনট্রাক্টরি করতে গিয়ে গরবাই-নালার সিমেণ্টের সেতু দু-দুবার জলের তোড়ে ভেঙে গেল, সাড়ে তিন হাজার টাকা আমার সামান্য পুঁজি থেকে বেরিয়ে গেল, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো পাওনাদারদের অত্যাচারে—তখন সামনে দেখলাম সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পথ জেলের ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েচে—

কতবার তখন ভেবেচি, সব ফেলে পালিয়ে যাবো বলিবা গ্রামে মাকা হো'র বাড়ি। সেই ঘন অরণ্যে শালফুলের আলস্য-মাখানো দিনগুলিতে চম্পু হো'র সঙ্গে নীরব ভাষার কথোপকথন। সেই নির্জ্জন রাত্রিগুলির নিবিড় মোহ।··

বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল।

বাড়ী গাড়ী করেছিলাম, বড়লোক হয়েছিলাম।

চম্পুর দেখা পাইনি, আজকার দিনটি ছাড়া।

কিন্তু এ কোন্ চম্পু? এ ইংরিজি বলে, মোটর চড়ে, সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। সেই সরলা বালাকে এর মধ্যে কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও উদগ্রীব হয়ে রইলাম সন্ধ্যার জন্যে।

এলিশাবা কুই এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। কেউ ছিল না ঘরে।

বল্লাম—মনে পড়ে?

হেসে বল্লে—সব।

—চম্পু, তোমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি তাই, না জানলে অবিশ্বাস করতাম। কি করে এমন হোলে? বলিবা ছাড়লে কেন? লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

—দশ মিনিটের·জন্যে এসেছি। অন্য সময় শুনবে। মিশনারি স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের গ্রামের হো পাদ্রী আমাকে রাঁচী নিয়ে যায়। মাকা মারা গেল, কেউ ছিল না গাঁয়ে, কে আশ্রয় দেয়? রাঁচীতে বল্লে, খৃষ্টান হোলে সব সুবিধে করে দেবে। সত্যি বলচি, এখন এসব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিবা গাঁয়ে। আগষ্ট আন্দোলনের পরে জেলে বসে বসে শুধু বলিবার কথাই ভাবতাম।

—আর কোনো কথা মনে পড়তো না?

চম্পু কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—না। কি কথা মনে পড়বে? মান রেখে কথা বলতে শেখো। জানো আমি কে?

আমি পাল্টা রাগের স্বরে বল্লাম—বেশ। দাও আমার বোতাম ফেরৎ—

চম্পু খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—কাল আসবো। মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছুতো করে এসেছি।

তারপর একটু থেমে বল্লে। বোতাম নিয়ে আসবো। হারাই নি।

খোলস

আমার ছেলেবেলা মহকুমার শহরে যখন স্কুলে পড়তাম তখন নীলমণি মল্লিক মশাযকে দেখতাম দামী শাল গায়ে দিযে বেড়াতেন, শহরের একজন নাম-করা উকিল। আমরা তখন তাঁকে ভয় করে চলতাম, আমাদেব স্কুলে মাঝে মাঝে এসে তিনি আমাদের পরীক্ষাও নিতেন।

নীলমণি মল্লিক সে সময়ে শহরের একজন বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সকলে তাঁকে সম্মান করে, ভয় করে। নীলমণি বাবুর কাজকর্ম্ম ঘড়ির কাঁটার মত চলে। সকালে উঠে তিনি প্রাতভ্রমণে বার হবেন, ফিরবার পথে মুন্সেফ বাবু ও মহকুমা হাকিমের বাড়ী ঘুরে কুশল জিজ্ঞাসা করে আসবেন। হয়তো বসে ওঁদের ওখানে একপেয়ালা চা খেয়েও আসতে পারেন। এব নাম হাকিমকে তুষ্ট রাখা। এতে কবে শহরে অনেক স্থবিধে আছে, বিশেষ করে মহকুমার মত জায়গায়, যেখানে এই হাকিমেরাই সব।

সেবার দীনবন্ধু সেন ডেপুটি বাবুর মেয়ের বিয়েতে নীলমণি বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বিয়ের রাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনা থেকে আরম্ভ করে রান্নার চালায় গিয়ে মাছ-ভাজার তদারক করা পর্য্যন্ত—সমস্ত কাজ নিজে যেমন উৎসাহ নিযে করেছিলেন, মেয়ের বাপ দীনবন্ধু সেন ডেপুটিও তেমন করতে পারেন নি।

পরের দিন বার লাইব্রেরীতে এজন্যে তাঁর সতীর্থ উকিল রামজয় বাঁড়ুয্যে নাকি বলেন, কি হে কাল কর্ম্মকর্ত্তা তুমি না দীনবন্ধু বাবু বোঝাই যাচ্ছিল না—

নীলমণি বাবু জানতেন তাঁর এই হাকিম তোষণের নীতি অনেকে এখানে ভালোচোখে দেখে না, আগে দেখতো এবং সেজন্য নীলমণি বাবুকে সাধাবণে খাতিরও করতো কিন্তু এখন পড়েছে স্বদেশীর যুগ, সুরেন বাঁড়ুয্যে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়ে দিলে আর কি—এখন হাকিমের বাড়ি বেশী যাতায়াত নাকি তত সম্মানজনক নয়।

নীলমণি বাবু রাগের সুরে বল্লেন—মানে?

—মানে কাজের বড্ড আঁটা দেখাচ্ছিলে কিনা তাই বলচি—

—তাতে তোমার কি ?

—না, আমার কিছু না। সকলেই বলছিল তাই—

আমি একথা শুনেছিলাম রামজয় বাবুর ছেলে নীরদের মুখে, সে আমার সহপাঠি ছিল। লোকে যে যা বলুক, নীলমণি বাবু গ্রাহ্য করেন না! তিনি আজ পনেরো বছর ধরে এই হাকিম-তোষণের ফলে সরকারী হাসপাতালের কমিটির সদস্য, পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সহকারী সভাপতি, লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতি, চৌকিদারী কমিটির সদস্য প্রভৃতি বহু সম্মানজনক পদে গবর্ণমেণ্ট থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দানশীল বলেও তাঁর একটা খ্যাতি আছে তবে ব্যাপারগুলো গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁসা হলেই তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। গবর্ণমেণ্ট দাতব্য হাসপাতালে একটা উইং বাড়ানোর জন্তে গবর্ণমেণ্টের হাতে তিনি সাড়ে চার হাজার টাকা সেদিন দিয়েচেন। এই রকম আরো অনেক আছে। তিনি গবর্ণমেণ্ট প্লীডারও বটে আজ আট ন'বছর ধরে। গবর্ণমেণ্ট প্লীডার একটা কতবড় সম্মানজনক পদ, যদিও এই ছোট মহকুমার শহরে গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের বিশেষ কাজ যে কিছু আছে তা নয়, তবে ওই যে বল্লাম একটা মস্ত সম্মান। সকলে তো গবর্ণমেণ্ট প্লীডার হতে পারে না। নীলমণি বাবুর ছাপানো চিঠির কাগজে লেখা আছে "এন, মল্লিক, বি, এল—গবর্ণমেণ্ট প্লীডার।" সম্মানও তিনি পেয়ে এসেচেন খুব। দু-তিনটি স্থানীয় স্কুলের তিনিই হর্ত্তা-কর্ত্তা। মোটা বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি হাতে করে যখন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরোন, তখন সকলেই সম্ভ্রমের স্থরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। লোককে জব্দ করতেও তিনি অদ্বিতীয়, টুক্ করে কোথায় কি লাগালেন, তার পর দিন থেকে তার পেছনে পুলিশ লেগে গেল।

একটা উদাহরণ দিলে এখানে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

শহরের বাজারে রামনাথ দাঁ তখন বড় ব্যবসাদার। তার ছেলে শিবু খুব সৌখীন মেজাজের লোক, বড়লোকের অপদার্থ ছেলে যেমন হয়ে থাকে।

মদ, গাঁজা, গুলি খায়—মাসের মধ্যে দশবার কলকাতায় ছোটে ফূর্তি করবার জন্যে। বাপের পয়সা দুহাতে ওড়ায়। রামনাথ দাঁ ওকে টাকা দিতো না, টাকা দিতো ওর ঠাকুরমা।

সেদিন নীলমণি বাবু বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেড়িয়ে ফিরচেন, ঠিক সেই সময় শিবু সদ্য ঘুম ভেঙ্গে উঠে তাদের বাড়িব দরজায় বসে বিড়ি টানচে। তিনি যখন খুব কাছে এসে পড়েচেন, তখনও বিড়ি ফেলে দেবার বা লুকিয়ে ফেলবার কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না, অথচ সে তাঁকে দেখতে পেয়েচে। নীলমণি বাবু আরও কাছে এসে পড়লেন, আর হাত বিশ-ত্রিশ দূর, তখনও শিবু বিড়ি খাচ্ছে। তারপর যখন একেবারে তার সঙ্গে একই সরলরেখায় এসে পডলেন নীলমণি বাবু, তখন শিবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আধপোড়া-বিড়ি-সমেত হাতটা একবার পেছন দিকে নিয়ে গেল মাত্র।

রাগে ও অপমানে নীলমণি বাবুর আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো।

এতবড় স্পর্দ্ধা শিবু দাঁর! ওর বাপ রাস্তা-ঘাটে দেখা হোলে মাথা নীচু করে প্রণাম করে, রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়—আর ও কি না—

বজ্রগম্ভীর স্বরে হেঁকে বল্লেন, এই শিবে—

শিবু বল্লে—আজ্ঞে, আমায় বলচেন?

তখনও সে রোয়াকে বসেই আছে।

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলচি।

—বলুন—

নীলমণি বল্লেন—তুমি না কালকেব ছেলে? গুরুলোকদের সামনে কি ভাবে চলতে হয়, তোমার বোঝা উচিত।

শিবুব অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সে উত্তর কবে বসলো—কেন, আমি কি করলাম? বারে! আপনি যাচ্চেন রাস্তা দিয়ে, আমি বসে আছি আমাব বাড়িতে। কি দোষ হোল এতে?

নীলমণি মল্লিকের স্বর অতিমাত্রায় কঠোর হয়ে পড়লো। বল্লেন—কি দোষ হয়েছে? দেখতে পাচ্চ না এখনো? আচ্ছা, দেখতে পাবে।

শিবু ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। নীলমণি বাবু অধিকতর দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে এলেন।

এরপরে থানা থেকে দারোগা এসে রামনাথ দাঁয়ের বাড়ি সার্চ্চ করলে, শিবুকে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। সে নাকি কি স্বদেশী হাঙ্গামায় জড়িত আছে। রামজয় বাঁড়ুয্যে জামিনের দরখাস্ত করে নিরাশ হোলেন। শিবু হাজতে দু-দিন দু-রাত কাটালে। শহরময় সোরগোল পড়ে গেল। এই সময় ঘুঘু রামজয় উকিলের পরামর্শে রামনাথ দাঁ গিয়ে নীলমণি মল্লিকের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। বাস্, সব ঠাণ্ডা।

এ সব আমার স্কুল-জীবনের সমসাময়িক ব্যাপার।

তারপর নীলমণি মল্লিক আরও বড় হয়ে উঠলেন মহকুমার শহরে। সব সভাতেই তিনি, সব সমিতিতেই তিনি। সব প্রতিষ্ঠানের তিনি হর্ত্তাকর্ত্তা। গবর্ণমেণ্টের খেতাবও পেলেন ইংরাজী নববর্ষের এক শুভদিনে। তিনি আরও উদার হয়ে উঠলেন, আরও দাতা হয়ে উঠলেন।

আমি তখন দেশে থাকি না। মহকুমার শহরটি বা তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যারা পাদচারণ করে তাদের কোনো খবরই রাখি না।

বছর পনেরো পরে আবার দেশে ফিরে এলাম।

রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক অনেক প্রবীণ হয়ে পড়েছেন। শহরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, হাকিম-তোষণ নীতির একনিষ্ঠ সেবক নীলমণি বাবু কিন্তু আগের উচ্চস্তরে এখন যেন নেই—লোকের চোখে। আমার সে স্কুলজীবনের দিনগুলির পরে ত্রিশ বছর কেটে গিয়েচে। এখনকার যারা তরুণ সম্প্রদায়, তারা দেখলুম ওঁকে আমল দেয় না।

দেশে ফিরে আসবার মাস-দুই পরে এর এক প্রমাণ পেলাম।

সুরনাথ উকিলের বৈঠকখানায় বসে আছি, সেখানে ছোকরা উকিল শুভেন্দু গাঙ্গুলী এসে বসলো। খুব ফড় ফড় করে ইংরেজি বলে, ঘন ঘন সিগারেট ফোঁকে (তবে আমার সামনে না), কথায় কথায় হাসে। তার মুখেই শুনলাম

সে এবার রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে হাই স্কুলের সেক্রেটারিত্বের ব্যাপারে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে।

আমি অবাক।

এ কি কখনো সম্ভব? নীলমণি মল্লিকের সঙ্গে টক্কর দিতে চলেচে তাঁর ছোট ছেলের বয়সী শুভেন্দু? যে নীলমণি বাবু আজ বিশ বছর ধরে স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁর সঙ্গে?

আমি বল্লাম—শুভেন্দু, এ সম্ভব হবে না। তুমি কার সঙ্গে লড়তে যাচ্চ, জানো?

শুভেন্দু বল্লে—আপনিই জানেন না দাদা। উনি আজ স্কুলটা গ্রাস করে বসে আছেন বিশ বছর। যেন সেকেলে ধরণে স্কুল চলেচে। নিউ ব্লাড্ না ঢুকলে আর—

—কিন্তু তুমি পারবে?

—সেকাল আর নেই দাদা। আপনি বহুদিন দেশে ছিলেন না। ওঁকে আর কেউ চায় না। ইয়্যং দল ওঁর ঘোর বিপক্ষে। তা ছাড়া সকলেই ওঁকে ধামাধরা বলে থাকে। মুন্সেফ ডেপুটীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চা খেয়ে বেড়ালে যে-সম্মান একদিন পাওয়া যেতো, এখন তার পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় ঘৃণা। আগে বল্তো, অমুক বাবু হাকিমের ডান-হাত বাঁ-হাত, অতএব ওঁকে খাতির করো। এখন বলে ও সেকেলে মেণ্টালিটির লোক, খোসামুদে। ওঁর সব শেষ হয়ে গিয়েচে। ওঁর দ্বারা আর কি হবে? নিউ ব্লাড্ চাই দাদা, নিউ ব্লাড্ চাই।

—তোমাকে ভোট দেবে সবাই?

—দেখুন কি হয়। আপনি জানেন না।

শুভেন্দু উঠে গেল। আমি সুরনাথ উকিলকে বল্লাম—শুভেন্দু বলে কি হে? ও পারবে নীলমণি কাকার সঙ্গে?

সুরনাথ বল্লে—নীলমণি বাবুর দিন চলে গিয়েচে। এখন সকলে ওঁকে আড়ালে ঠাট্টা করে।

—বল কি হে?

—তাই। ওঁর সমসাময়িক উকিল আর কেউ নেই এক হৃদয় চক্কত্তি ছাড়া। তা হৃদয় চক্কত্তি আজ প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন দশ বছর। পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু আমাদের রায়বাহাদুর এখনো দুবেলা সেই রকম ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে যান পাম্প শু পরে, সিগারেট খেতে খেতে। লাইক এ্যান্ ওল্ড স্নব্, হ্যাট্ হি ইজ—হি হি—

রাস্তায় নেমে একটু দূর গিয়েই রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার দেখা।

শীতকাল। দামি জামিয়ার গায়ে দিয়ে মলক্কা বেতের ছড়ি উল্টো করে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি পঁচিশ বছরের যুবকের দর্পে ও তেজে পথ চলচেন। আজকালকার যুবক নয়—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবক, যাদের চোখে ছিল শেষ ভিক্টোরিয় যুগের মোহ-অঞ্জন, নিশ্চিন্ত ব্রিটিশ-প্রীতি, ব্রিটিশ জাষ্টিসের প্রতি অগাধ ও অটুট বিশ্বাস।

আমায় অনেক দিন পরে দেখেও কিন্তু নীলমণি কাকা কথা বল্লেন না।

কেননা আমি 'কমনার্'; তাঁর সেটের লোক নই।

তিনি আমায় খুব ভাল জানেন, আমার বালক কাল থেকে দেখে আসচেন আমাকে। কিন্তু ওই যে বল্লাম, ওই এক ধরণের লোক থাকে। ওল্ড্ স্নব বটে, পয়লা নম্বরের স্নব। নাক-উঁচু লোক।

আমি হৃদ্যতার স্বরে বল্লাম—কাকা ভালো আছেন? অনেক দিন পরে দেখলাম আপনাকে—

—হুঁ।

—জ্ঞান আজকাল কোথায় আছে?

—কলকাতায়।

ব্যস্—আমার অযথা ঘনিষ্ঠতা করবার প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই নির্ম্মূল করে দিয়ে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক উল্টো-করে-ধরা মলক্কা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেলেন।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

আমার কষ্ট হোল। পিতার বয়সী লোক। এ সব মানুষ জানে না

যে যুগ বদলে যাচ্চে ওদের চোখের ওপরে? কিছুই দেখে না—দেখেও দেখে না?

স্কুলের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নীলমণিবাবু হেরে গেলেন। হেরে গিয়েও নির্ব্বাচন ব্যাপারের কি একটা খুঁৎ ধরে তিনি আবার এক মোকর্দ্দমা করলেন, তাতেও হেরে গেলেন।

গত ত্রিশবৎসরে এই ক্ষুদ্র শহরটির বুকে রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিক এক একখানি করে ইট বসিয়ে সম্ভ্রমের যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করেছিলেন, আজ এক অর্ব্বাচীন যুবকের হাতের আঙুলের এক ধাক্কায় তা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এরপর থেকে কি যে হোল, বালিকা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব একে একে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যে লাইব্রেরীর জন্যে তিনি কত কৌশলে চাঁদা আদায় করে, গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্য বার করে বর্ত্তমান পাকাবাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই লাইব্রেরীর কমিটির মধ্যেও তাঁর নাম আর রইল না। অথচ তিনি ঐ কমিটির সহকারী সভাপতি ছিলেন গত পনেরো বছর যাবৎ। সভাপতি অবিশ্যি ছিলেন মহকুমার হাকিম, সেও রায় বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমেই। হাকিম, মুন্সেফ, সরকারী ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি যাতে সন্ধ্যার সময় এসে লাইব্রেরিতে তাস খেলতে পারেন, তার সুবন্দোবস্তও করে রেখেছিলেন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর বলতেন—আরে, ওরা আসা ভালো, এতে লাইব্রেরির প্রেষ্টিজ বাড়ে। দরকার হোলে দুপয়সা সাহায্য দেবার মালিক তো ওরাই।

এই লাইব্রেরিতে কতবার বদলির আদেশপ্রাপ্ত হাকিমদের বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হয়েচে তাদের হিসেব ওর প্রত্যেকখানা ইটে লেখা থাকলে সব ইট ভর্ত্তি হয়ে যেতো আজ। শুধু কি হাকিম, তা হোলেও তো কথা ছিল। কি সমাচার, সরকারী ডাক্তার বদলি হচ্ছেন, করো বিদায় সভা। কি সমাচার, ছোট দারোগা বদলি হচ্ছেন, করো বিদায়-সভা। বিদায়-সভার চাঁদার চোটে

লোক বিরক্ত। এ সব আগে আগে ঘটে গিয়েচে, তখন তিনি ছিলেন শহরের নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনেকের ভীতির স্থল। সুতরাং লোকে দিয়েচেও বিনা কৈফিয়তে।

জেলার শহর থেকে জজসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছেন, নীলমণিবাবু পূর্ব্বাহ্ণে খবর পেয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই জজসাহেব মোটরে যাবেন কলকাতায়। অমনি একঘণ্টার মধ্যে বিদায় সভার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেল্লেন। মোটর সাজানো হোল নীলমণিবাবুর বাড়ির সামনে, সভার অনুষ্ঠান হোল ওঁর বাড়ির বৈঠকখানার বারান্দায়। সিঙ্গেড়া, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, চা, ফুলের মালা, গান কোনো কিছুরই ত্রুটি হোল না। সব খরচ বহন করলেন অবিশ্যি তিনি নিজেই।

রামজয় বাঁড়ুয্যের দল বল্লে—অস্তগামী সূর্য্যের পূজোয় কি হবে ভায়া ? ও যখন চলে যাচ্ছে তখন থাক না। ওদের সম্মান দেখানো তো ওদের ব্যক্তিগত মেরিটের জন্যে নয়, পদের জন্যে। সে পদ ছেড়ে সে যখন চললো, তখন আর কেন ?

নীলমণিবাবুর প্রায় একশো টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল, এ সব খরচের বেলা তিনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। এ সব সেকালের কথা নয়, সেদিনের কথা।

হঠাৎ কিন্তু দিন বদলে গেল আশ্চর্য্যভাবে। কয়েক বছরের মধ্যে। কি রকম একটা হাওয়া এসে ঢুকলো শহরে। ছেলে-ছোকরার দল সব বিষয়ে এগিয়ে এসে হোল পাণ্ডা। লাইব্রেরি তারা দখল করলে, বল্লে—বুড়োদের দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। একখানা আধুনিক কালের বই নেই—সব সেকেলে। শুধু হাকিমহুকুমদের তাসখেলার আড্ডা হয়ে রয়েচে লাইব্রেরি—আজ বিশ বছর ধরে। এ অচলায়তন আমরা ভাঙবো।

তারা নিজেদের মধ্যে দল পাকিয়ে হৈ হৈ করে ছাপানো কাগজ শহরময় বিলি করে জানিয়ে দিলে শহরের সব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা জং-ধরা প্রাচীন ফসিলদের তাড়িয়ে নিজেরা ঢুকে পড়বে। তাড়ালোও তারা। লাইব্রেরিতে এক কংগ্রেসী সভা করতেই হাকিমের দল সরে দাঁড়ালো—তাসের আড্ডা

হাওয়া হয়ে গেল। তারপরই ধরলে এক সাহিত্যসভা—কলকাতা থেকে নবীনপন্থী প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদল এলেন। তাঁদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শহরময় শোভাযাত্রা বার করা হোল—বহু প্রবন্ধ পাঠ, বহু বক্তৃতাদান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হোল। দেশের স্বাধীনতা নিয়েও অনেক কথাবার্ত্তা হোল সে সভায়।

রায়বাহাদুর সে সভার ত্রিসীমানায় পা দেন নি। কিন্তু যত দিন যায়, তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন কিছু বুঝতে পারেন না। এ সব কি দিন এসে গেল? ছেলে-ছোকরার দল আর তাঁকে দেখে সম্ভ্রম করে না, হাকিম পুলিশ পেয়াদা আরদালিদেরও আর যেন সুদিন নেই, কোথায় সেই সব রক্তচক্ষু দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হাকিমের দল সেকালের। সব যেন মিইয়ে গেল। নইলে মুন্সেফবাবু এখন সুরনাথ বাবুদের ক্লাবে বসে আড্ডা দেন? মনে পড়ে সেকালের মহেন্দ্রবাবু ডেপুটির কথা। এখনো অনেকে তাঁকে মনে রেখেচে বৃদ্ধদের মধ্যে। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো তাঁর প্রতাপে। কারো বাড়ি যেতেন না, কোর্টের বাইরে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতেন না। নীলমণিবাবুর বড় মেয়ের বিবাহে কাপড় মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের মারফৎ—নিজে আসেন নি।

পরদিন সকালে সব কাজ ফেলে নীলমণিবাবু ডেপুটিবাবুর বাংলায় গেলেন কাপড় মিষ্টি পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ দিতে। বল্লেন—আপনি গেলেন না কাল হুজুর, কাল সকলেই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্রবাবু বসে চিঠিপত্র লিখছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—সেটা আমার ত্রুটি নিশ্চয়ই, আমি স্বীকার করি।

—না হুজুরের ত্রুটি হয়েচে তা কি বলতে পারি, তা নয়—

—না না ত্রুটি নিশ্চয়ই। তবে কি জানেন নীলমণিবাবু, এখানে আমি সামাজিক জীব নই, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। আমাকে নিমন্ত্রণ না করাই আপনাদের উচিত।

—সে কি কথা বলচেন আপনি—তা কি কখনো—

—আমি ঠিকই বলচি নীলমণিবাবু। ভবিষ্যতে আপনার বাড়ীর কোনো অনুষ্ঠানে আর আমাকে নিমন্ত্রণ না করলেই আমি সুখী হবো। কারণ এতে আমায় লজ্জায় ফেলা হয় মাত্র।

সরল সোজা কথা। তেমন ধরণের লোক আর আসে না। সব যেন মিইয়ে গিয়েচে।

তারপর কিছুকাল কেটে গেল।

রায়বাহাদুরের অস্তিত্ব যেন এ শহর ভুলে গিয়েচে। কোনো অনুষ্ঠানেই আর তিনি কর্ম্মকর্ত্তা নন, কোনো সভার সভাপতি নন। কেউ তাঁর কাছে যায় না কোনো বড় কাজের পরামর্শ নিতে। একদিন যাঁর পরামর্শ ভিন্ন এ শহরের লোকের চলতো না, আজ তাঁকে বাদ দিয়েও লোকের দিব্যি চলচে।

রামজয় বাঁড়ুয্যে মারা গিয়েচেন, রায়বাহাদুরের সমসাময়িক উকীলদের মধ্যে দু-একজন মাত্র জীবিত আছেন। নীলমণিবাবুও কোর্টে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন। তবে ছড়ি ঘুরিয়ে এখনও ভ্রমণে বার হয়ে থাকেন সেকালের মত।

চৈত্র মাসের প্রথমে এবার আমি অনেকদিন পরে মহকুমার শহরে গেলাম। তখন শহরে জেলার ছাত্র-সম্মেলন হবার বিরাট তোড়জোড় চলচে। একদিন সকালে নীলমণিবাবুর সঙ্গে দেখা রাস্তায়। বৃদ্ধ ছড়ি ঘুরিয়ে পথে চলেচেন আগেকার মতই। আগেকার সুচেহারা আর নেই, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হোল, জরার অধিকারের চিহ্ন সারাদেহে। আমি কথা বল্লেও উনি কথা বলবেন না জানি, কারণ আমি ছেলে খেপিয়ে বেড়াই, উনি জানেন এবং বোধ হয় সেজন্যেই আমায় পছন্দ করেন না। পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কোনো কথা বল্লেন না আমার সঙ্গে। আমার সামনে এসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

ছাত্রের দল আমার কাছে এল ওদের সম্মেলন সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি তাদের বল্লাম, আমার অনুরোধ এবার নীলমণি বাবুকে সম্মেলনের সভাপতি করতে হবে।

তারা বল্লে—আপনি কি বলচেন ? উনি সভাপতি হোলে লোকে কি বলবে ?

—যে যাই বলুক, তোমরা ওঁকেই সভাপতি করো। উনি আর ক'দিন ? অনেক কিছু উনি করেচেন একসময়ে এই শহরের জন্যে। সে সব আজ লোকে ভুলে গিয়েচে। ওঁর সম্মান ওঁকে দাও। এ কথা তোমাদের রাখতেই হবে।

বহুকষ্টে ওদের রাজি করে রায়বাহাদুরের কাছে আমি নিজে ওদের নিয়ে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা। রায়বাহাদুর বৈঠকখানায় বসে ওঁর মুহুরি জীবন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াতেই বল্লেন—কে ?

—আজ্ঞে, কাকাবাবু আমি।

—ও, এসো। কি মনে করে ?

আমার ইঙ্গিতে ছাত্রের দল এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়ালো। তারপর ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরের পায়ে হাত দিয়ে এরা প্রণাম করলে। বিস্মিত রায়বাহাদুর কিছু বলবার পূর্ব্বে আমি বল্লাম—কাকাবাবু, এরা আপনার কাছে এসেচে, এদের ছাত্র কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হবে কাল এখানে—আপনার কাছে আসতে তো সাহসই করছিল না, আমি ওদের বল্লাম—চলো নিয়ে যাচ্ছি, কোন ভয় নেই, তিনি ছাড়া উপযুক্ত লোক আর আছেই বা কে এখানে ? তাই এরা এসেচে, আপনাকে কাল ওদের সম্মেলনে প্রিজাইড্ করতে হবে। আপনাকে রাজি হোতেই হবে, নিরাশ করবেন না। আমি জানি আপনি খুব বিজি লোক, কিন্তু এদেরও তো একটা দাবি আছে আপনার ওপর—

রায়বাহাদুর চমকিত, অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ যেন তাঁর মুখে কথা বার হল না।

ছাত্রদের চাঁই সুধীর অমনি হাতজোড় করে বল্লে—আমাদের নিরাশ করবেন না সার, আপনি ছাড়া আর কেউ উপযুক্ত লোক নেই এখানে—

—বেশ, বেশ। তা হবে। বোসো বোসো তোমরা—

রায়বাহাদুর অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—ওহে নরেন, বোসো বাবা বোসো—সে সব হবে এখন, তুমি যখন নিজে এসেচ

তখন আর 'না' বলতে পারিনে। একটু চা খাও সব, বোসো—ওরে—শোন্—ও হৃদে—আচ্ছা সব বোসো, আমি বাড়ির মধ্যে থেকে আসচি—এক মিনিট—

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জন্যে বেশ ভালো জলখাবার এল, কচুরি, নিমকি, সন্দেশ, পেঁপে-কাটা ইত্যাদি। ছাত্রেরা জলখাবার খেয়েই চলে গেল, তারা কেউ চা খাবে না। আমাকে একা পেয়ে রায়বাহাদুর নিজের বহু পূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা প্রাণভরে আমার কাছে বলে গেলেন। এ শহরে কিছুই ছিল না, না লাইব্রেরি, না বালিকা বিদ্যালয় না প্রসূতি ভবন। যা কিছু করেচেন, তিনিই করেচেন। ডেপুটি মুন্সেফবাবুরা তাঁকে খাতির করতেন কত। স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তাঁর বাড়ি এসে চা খেয়েচেন। আজই এখানকার লোকে তাঁকে পোঁছে না।

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—আপনাকে চিনবে কে, জানবে কে কাকাবাবু? সবাই কি সকলকে জানতে পারে? ওরা আমায় বল্লে আপনার কথা। সাহসই পায় না এগোতে। বলে, অত বড় লোক কি আমাদের সভায় প্রিজাইড করতে রাজি হবেন? আসতে চায় সবাই, আসতে ভয় পায়—

—বোসো বোসো, বাবা, উঠচো কেন? আর একটু চা খাবে না?

—আজ্ঞে না কাকাবাবু! অনেক কাজ আছে, উঠি। আপনার মত লোককে নিয়ে যেতে হোলে তার উপযুক্ত তোড়জোড় করতে হবে তো? আশীর্ব্বাদ করুন যেন ওরা সফল হয়—

আমরা পরদিন ওঁকে মস্ত বড় শোভাযাত্রা করে গলায় ফুলের মালা দিয়ে সভাস্থলে নিয়ে গেলাম। গত দশ বৎসরের মধ্যে কেউ তাঁকে ডাকেনি। বিস্মৃত, উপেক্ষিত রায়বাহাদুর নীলমণি মল্লিকের বহুদিনের অজ্ঞাতবাস মহাসমারোহে আমরা ভঙ্গ করলাম। সভায় অনেক ভালো ভালো লোক এসেছিলেন, জেলা ছাত্র কংগ্রেসের বিরাট সভা, যথেষ্ট আয়োজন, যথেষ্ট আড়ম্বর। বন্দেমাতরম গান হোল, জয় হিন্দ্ গান হোল। রায়বাহাদুর মুগ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। সেক্রেটারি তার রিপোর্টে রায়বাহাদুরের

যথেষ্ট প্রশংসা করে বল্লে, এ জেলায় তাঁর মত বদান্য, উদার, দেশহিতৈষী লোক আর দ্বিতীয় নেই।

সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রায়বাহাদুর এই সর্ব্বপ্রথম জীবনে প্রকাশ্য সভায় দেশের স্বাধীনতার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মহাত্মাজির প্রশংসা করলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় তাঁর বচন স্খলিত হতে লাগলো উত্তেজনায়। আমরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—ইনি কি সেই নীলমণি মল্লিক?

ভাষণের শেষে ঘোষণা করলেন ছাত্রসংঘের তহবিলে পাঁচশো টাকা তিনি দেবেন।

রায়বাহাদুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল। সকলে বলতে লাগলো—লোকটার মধ্যে জিনিস ছিল।

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা। বেতের ছড়ি ঘুরিয়ে রায়বাহাদুর সদর্পে পথ চলেচেন। আমায় দেখে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বল্লেন—কোথায় চল্লে বাবাজি? বেড়াতে? বেশ বেশ। তোমাকে দেখলে চোখ জুড়োয়। জেলার একটি রত্ন তুমি। তোমার বাবা—

হঠাৎ আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর।

চৌধুরাণী

এ ইতিহাস আজকালকার দিনে শোনাবার মত বলেই শোনাচ্ছি।

যদি লিখে রেখে না দিই—এ কথা কেউ জানতে পারবে না। অনেক লোকের উপকার হবে পড়লে এই বিশ্বাসেই লেখা।

আমার ছেলেবেলাতে গ্রামের ওপাড়ায় রামলাল কাকার হাঁকডাক ছিল। সমস্ত মালপাড়ার লোকে তাঁর প্রজা, তার মুখের হুকুমে একশো জোয়ান মরদ পুরুষ লাঠি হাতে এগিয়ে আসতো। শক্ত হাতে লাঠি না ধরতে পারলে তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে জমিজমা রাখা যেত না। জমি নিয়ে দাঙ্গা, জমির ফসল লুঠতরাজ—এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

রামলাল কাকার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার মায়ের চেয়ে তিন বছরের বড়, তিনি ছিলেন মায়ের সই, তাঁকে সইমা বলে ডাকতাম। সইমা লোক ভালো ছিলেন বলে শুনিনি, সারা বাল্যকাল ধরে তাঁর নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে তাঁর জাঁহাবাজি ঝগড়ার কথা শুনে এসেছি।

শাশুড়ীরা বৌএর ওপর অত্যাচার করে একথা বাংলাদেশে সবাই জানে। কিন্তু অত্যাচারিতা অনেক বধূ তখন আমার এই সই-মার নামে পুলকিত হয়ে উঠতো।

এমন এক নিপীড়িতা বধূকেই আমি বলতে শুনেছি ঘাটের পথে :—

—বৌ বলতে বৌ হোল ওপাড়ার হরির মা। আমরা জন্মেছি ছাগল ভেড়া। শাশুড়িকে কি করে ছেঁচতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েচে।

তাঁর সঙ্গিনী বল্লে—কাল নাকি সেজগিন্নির মুখে বৌ কেরাসিনের টেমির ছেঁকা দিয়েছে—সেজগিন্নি তাই সহ্যি করে বাপু। আমাদের মত শাশুড়ী যদি হোত—

—সহ্যি না করে উপায় কি বলো। জাঁহাবেজে বৌ-যে। পেরে না উঠলে, সহ্যি করতেই হচ্ছে বই কি।

—তা ধন্যি বৌ বটে। আষাঢ় মাসে দুদিন খেতেই দিলে না শাশুড়ীকে। মুখের জোরে দাঁড়াবে কে সামনে? সেজগিন্নির কর্ম্ম নয়।

—শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করবার সময়ে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে। অমন বৌ ঘরে ঘরে হোলে শাশুড়ীরা জব্দ।

—আমরা পারি নে বাপু, ভয় করে।

—সেই জন্যেই ঝাঁটালাথি খাচ্ছি উঠতে বসতে। কাল হয়েচে কি, মুগের ডাল রোদে দেওয়া ছিল, বিষ্টি এসেচে কখন দেখতে পাইনি—খুঁকীর কাঁথা সেলাই করচি—সে কি গালাগাল! আচ্ছা গালাগাল দাও না হয় দিলে—কিন্তু বাপ ভাই কি দোষ করলে? তাদের তুলে গালাগাল দেওয়া কেন বলো তো ভাই?

—বলবো আর কি! নিজেই দুবেলা স্বচক্ষে দেখচি, স্বকর্ণে শুনচি। হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেল ভাই। এক সময় মনে হয় একদিকে বেরিয়ে যাই—আর ভাল লাগে না—

সই-মা দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন। সবাই তাঁকে সুন্দরী বলতো। তাঁর পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে হয়। বড় ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি। অল্পবয়সে জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবী কাজে ভর্ত্তি হোল।

এই সময় সই-মা মারা গেলেন। রামলাল কাকা আবার বিবাহ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিন চারটি ছেলেমেয়েও হোল। কিছুদিন পরে রামলাল কাকা আবার বিপত্নীক হোলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিবাহ করলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরও পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে হোল।

মাঝের পক্ষের প্রথম সন্তানের নাম আশালতা, বেশ সুন্দরী মেয়ে। রামলাল কাকা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করবার কিছুদিন পরেই আশালতার ভাই বোনগুলি একে একে মারা গিয়ে বেঁচে রইল কেবল সে নিজে।

আশালতার বিয়ে হোল এগারো বছর বয়সে এবং ষোলবছর বয়সে সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল। কন্যা বিধবা হয়ে বাড়ি আসার পর থেকে শোকে

রামলাল কাকার শরীর ভেঙে পড়লো এবং বছর খানেকের মধ্যে তিনিও ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এর মুখ্য কারণ কন্যার বৈধব্য নয়, কেন না রামলাল কাকার মৃত্যু হয়েছিল বসন্ত রোগে। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

এখন আসল কাহিনী সুরু করা যাক।

আমাদের এ ইতিহাস প্রধানতঃ আশালতার ইতিহাস।

ব্যাপারটি এখন দাঁড়িয়েছে যা তা এখানে আর একবার বলি।

রামলাল কাকার সংসারে এখন কর্ত্তা হয়ে দাঁড়ালো ওঁর প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ। শরতের তখন বিয়ে হয়েছে এবং দুটি সন্তানও হয়েছে। শরতের ছোট ভাই সনতও লেখাপড়া শেখেনি, সে গ্রামেই ধানের ব্যবসা করে। প্রথম পক্ষের মেয়ে ক-টির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, তারা সকলেই শ্বশুরবাড়ি।

রামলাল কাকার তৃতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির বয়স কম। বড়টি ছেলে, তার বয়েস এই সময় আট।

রামলাল কাকা সম্পত্তিওয়ালা লোক ছিলেন। বড় ছেলে শরৎ এমন দুষ্টু-ফন্দি সব আঁটতে লাগলো, যাতে তার নাবালক বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলি সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিমাতার কোন কথা এ সংসারে খাটে না, তাঁর বয়েসও খুব বেশী কিছু নয়। শরৎ জমি মৌরসী বন্দোবস্ত করতে লাগলো মোটা টাকা নিয়ে। পুকুর জমা দিতে লাগলো নিকিরিদের কাছে মোটা টাকা নিয়ে। গোলার ধান বিক্রি করে ফেলতে লাগলো আড়তদারদের কাছে, তাতে পেতে লাগলো মোটা টাকা। গাছের নারকোল সুপুরি বিক্রি করতে লাগলো কলকাতার যারা মাল চালান দেয় তাদের কাছে।

অথচ ওর বিমাতা বা বৈমাত্রেয় ভাইবোনগুলির পরণে কাপড় নেই, স্কুল পাঠশালায় যাবার বন্দোবস্ত নেই, যা টাকা পাওয়া যাচ্ছে ওরা ত ন্যায্য-অংশীদার —অথচ শরৎ বা সনৎ সে চিজ্ নয়, সোজা পথে হাঁটা অভ্যেস তাদের নেই, বিমাতা মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করেন না, নিজের চেয়ে বেশী বয়সের সৎছেলের কাছে।

এভাবে অরাজকতা চললো বছর দুই।

শরতের বিমাতা মুখ বুজে সব সহ্য করেন।

তিনি গরীব ঘরের মেয়ে। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে এসেছিলেন এ সংসারে। যা জোর ছিল এখানে, বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু গিয়েচে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সৎ ছেলেকে কিছু বলতে সাহস করেন না তিনি। নির্জ্জনে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা বিষয় সম্পত্তির কি বোঝে, মহা আনন্দে লাট্টু ঘোরায় আর ঘুড়ি ওড়ায় পথে পথে মাঠে মাঠে।

শীতকাল। সকালবেলা।

শরৎ এক বাটি মুড়ি খাচ্চে বসে, এখুনি চা খেয়ে সে বেরুবে।

আশালতা এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লে—বড়দা!

শরৎ মুখ তুলে বললে—কিরে?

—একটা কথা তোমায় বলবো।

—কি? বল তাড়াতাড়ি। আমার সময় নেই। কাছারিতে বেরুতে হবে এখুনি।

—তুমি বাগদিপাড়ার জমি বন্দোবস্ত করেছ কত টাকায়?

—কবে?

—এই যে সেদিন করে এলে? বৌদিদির হাতে টাকা এনে দিলে?

—কেন অত খোঁজে তোমার দরকার কি?

আশালতা মুখ গম্ভীর করে দাদার সামনে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরী মেয়ে নিরাভরণা বিধবার বেশ, চাপা রাগে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে—দাদা আজ আমি যে কথা বলতে এসেছি শোনো। তুমি ও রকম করে বিধু নিধুকে ফাঁকি দিতে পারবে না বলে দিচ্চি—

শরৎ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা যে আশালতা তাকে বলতে পারে, এটাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না তখনো। অতটুকু মেয়ে আশালতা!

পরক্ষণেই রাগে ও বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে গিয়ে আটকে রইল

খানিকক্ষণ। যখন কথাটা বেরিয়ে এল অবশেষে, তা বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। তার মানে বোঝা গেল না।

—কি? জমি কার?......টাকা—বিধু নিধুর ফাঁকি মানে?

—শোনো দাদা। বিধু নিধু আছে, ওর তিনটি বোন আছে। ওদের তুমি ছাখো না। মা ভাল মানুষ, তিনি কিছু বলতে পারেন না। ওদের পরণে না আছে কাপড়, না গায়ে একটা জামা। মা একখানা থান, তাই শুকিয়ে নেয়। বিধু বড় হয়েচে, ওকে স্কুলে দিলে না। ওরা সব খাবে কি এর পরে?

—কি খাবে সে আমি কি জানি? আমারই বা কি দায় পড়েচে বিধুর পড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার। বাবা থাকতেই তো আমাকে আর সনৎকে পৃথক করে দিয়ে গিয়েচেন। কিন্তু সে সব কথার কি দরকার এখন জিগ্যেস করি? তোমার সে সর্দ্দারি করবার দরবার কি?

আশালতা দৃঢস্বরে বললে—সর্দ্দারি করিনি দাদা, কিন্তু না বলেও আর পারছি নে। মা কিছু বলেন না, কিন্তু এটুকু তো বোঝেন যে বিধু নিধু ফাঁকে পড়চে। তুমি যে জমি বিলি করলে, বাঁশ ধান বিক্রি করলে, পুকুর জমা দিলে —সে টাকার ভাগ ওরা পাবে না? অথচ ওদের পরণে না আছে কাপড়, না আছে ওদের গায়ে একটা জামা—

শরৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—এত বড় কথা তোর! তুই কথা বলতে আসবার কে শুনি? তোর কি ভাগ আছে বিষয়ের? তোর কোন্ জোর এখানে খাটবে শুনি?

—আমার কথা তো একটুও বলিনি দাদা। বিধু নিধুর ভাগ ওদের দাও। মাকে দাও। শৈলবালার বিয়ে দিতে হবে আজ বাদে কাল, সবই যদি বেচে কিনে ফেললে, কাল শৈলর বিয়ে হবে কি দিয়ে?

—সে ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্চে না। মা গিয়ে বুঝুন তাঁর মেয়ের বিয়ে কি দিয়ে হবে। আমার তাতে কি?

—এই কথা তোমার উপযুক্ত হোল দাদা? শৈলর বিয়ে না হোলে কার মুখ হাসবে? মার না তোমার? লোকে বলবে অমুকের বোনের বিয়ে হোল

না, ধুমসি করে ঘরে রেখেচে। রাগ কোরো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার কিছু চাইনে। একবেলা দুটো আলো চালের ভাত, একখানা কাপড়। কিন্তু বিধু নিধুকে স্কুলে দাও, এর পর ওরা করে খাবে কি? তোমারই দোষ দেবে লোকে, আমাকে কেউ বলতে আসবে না। ভেবে ছাখো।

শরৎ একটা বড় ধাক্কা খেলে এই দিনটিতে।

এতদিন তার বিশ্বাস ছিল সে যখন সংসারের কর্ত্তা, সে যা করবে তাই হবে। অবিশ্যি বাবা তাকে ও সনৎকে পৃথক করে দিয়ে গিয়েচেন কিন্তু হঠাৎ পরলোক গমন করাতে পাকাপাকি কিছু করে যেতে পারেননি বিষয় আশয়ের। নগদ টাকার দরকার হোলেই জমি বিলি, ধান বিক্রি, ইচ্ছামত খাজনা আদায় ইত্যাদি করলে বাধা দিচ্চে কে তাকে? বিমাতা বাধা দিতে সাহস করবেন না, হাব্বা-গোব্বা ভীতু মানুষ। আজ সে দেখলে এ বাড়িতে এমন একজন আছে, যে তার আঙুল উঁচিয়েচে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ওর খেয়ালখুসির বিপক্ষে। আর সে কি না আশালতা?

যাকে কাল দত্ত মশায়ের পাঠশালাতে হাত ধরে জোর করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে! কেন না ও পাঠশালায় যাবার নামে কেঁদে আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই সনৎকে ডেকে বললে—আশার কাণ্ড শুনিচিস?

—কি?

—ও নাকি আমাকে দেখে নেবে। আমি নাকি বিধু নিধুকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-আশয়ের বিলিব্যবস্থা করছি। ওইটুকু মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

—তাই তো।

—এর একটা বিহিত করতে হবে সনৎ। আশার কি জোর খাটে এ-সংসারে?

—তা বলে ছাখো।

—তুইও বলবি। আমার সঙ্গেই বলবি।

—বেশ।

—কালই সকালে বলা যাবে। ওকে তাড়িয়ে তবে আর কাজ। বড্ড বাড় বেড়েচে ওর। আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েচে আজ।

—আমি বলবো এখন বুঝিয়ে—

—বুঝিয়ে টুঝিয়ে বলার কিছু নেই। ওকে বিদেয় করে দেবো কালই।

—বেশ।

সনৎ তখন দিব্যি রাজি হয়ে গেল, কিন্তু সকালে এসে বললে—দাদা, ওই যে কাল বলছিলে আমাকে বলবার কথা না?

—হাঁ, তা কি?

—আমি ও সব পারবো না। তুমি যা হয় কোরো—

—সে হবে না। তোকেও বলতে হবে—

—আমি ভেবে দেখলাম, ও সব কথার মধ্যে আমার না থাকাই ভালো।

—তুই আমাকে ভয় করিস, না মাকে ভয় করিস?

—কাউকে ভয় করিনে। মা আমাদের দুজনকেই ভয় করে চলে দাদা, সে তুমি জানো। মা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—নিরীহ প্রাণী। তাকে আবার ভয় করবার কি আছে?

—তবে তুই কেন বলবিনে আশাকে?

—না দাদা। আশা আমাদের কোলপোঁছা বোনটা। ওর মা নেই, বাপ নেই, স্বামীপুত্তুর নেই। আমি ওকে ও সব কথা বলতে পারবো না।

শরৎ মুস্কিলে পড়ে গেল। দুই ভাই একযোগে কাজ করলে যে জোর পৌঁছতো, সে তো পৌঁছলোও না, তার ওপর সে দেখলে আশার ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে সনতের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়া বোধ হয় বিচিত্র নয়। সনৎ এত দরদ দেখাবে আশার ওপর তা কে জানে। একেবারে গদগদ গোদাবরী! বলিহারি।

কিন্তু শরতের এ ধারণা ভুলও বটে, আবার নয়ও বটে।

সেদিনই সনৎ আশাকে সিঁড়ির নিচের ঘরে নির্জ্জনে ডেকে বললে—তুই কি বলেছিস দাদাকে ?

—কেন কি বলবো ?

—চোখ রাঙিয়েচিস্ শুনলাম—

—ওমা, মাথা কুটবো তোর সামনে ছোড়দা ? আমি চোখ রাঙাবো বড়দাকে ? আমি নেয্য কথা বলিচি—

—কি কথা শুনি।

আশা সব ব্যাপার বললে। বলে কাঁদতে লাগলো।

সনৎ বললে—কেঁদে মরচিস কেন তুই ?

—না ছোড়দা, তুই বল্ আমি কি অন্যাই কথা বলিচি—

—তাই তো।

—আহা, মার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায় ছোড়দা। তুইই বল। বড়দা এতগুলো টাকা পেলেন, জমি বিলি করে, জিনিস বিক্রি করে—একটা পয়সা মার হাতে দিয়ে বলেচেন, মা তুমি একাদশীর দিন একটু মিষ্টি কিনে খেও কি শৈলকে একটা ফ্রক কিনে দিও ? আহা, কিছু পরবার নেই ওর, শাড়ীর পাড় জুড়ে জুড়ে আমি সেদিন ওর একটা ফ্রক করে দিয়েচি তবে পরে বাঁচে। কে আছে ছোড়দা ওদের মুখে তাকাবার ? মা তো ওই হতগজ—

—হতগজ না ভালমানুষ।

—তার মানেই তাই। তুমি গায়ে আগুন ঢেলে দাও, রা কাটবে না। এদিকে বিধু নিধু শৈল ভেসে যাক !

—তা তুই আমাকে বললি না কেন, আমি দাদাকে বলতাম—

—তুইও ওই এক রকম ছোড়দা। তোর দ্বারা হোত না।

সনৎ আশাকে যতই স্নেহ করুক, সে বেশিদিন বাঁচেনি। সেই বছর শীতের শেষে নিমোনিয়া হয়ে সাত আটদিন ভুগে সে মারা গেল। আশা দিনরাত রোগীর পাশে বসে সেবা করতো; সারাদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে। মজুমদার গিন্নির মুখে আমি একথা শুনেছি। কারণ সে সময় দেশে থাকতাম

না। মজুমদার গিন্নি যার খুঁৎ ধরতেন না, সে সত্যিই একজন বুদ্ধ বা খৃষ্ট। মজুমদার গিন্নী বলেছিলেন—সৎমায়ের পেটের বোন বটে, কিন্তু নিজের বোন কমই আছে আজকাল, যারা অমন করে ভাইয়ের সেবা করে।

ওঁর মুখে এইটুকু কথার মূল্য অনেকখানি।

সনতের মৃত্যুর পরে, সংসারে শরতের একাধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোল। বাধা দেবার আর কেউ রইল না। রামলাল কাকার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে যা ছিল ভালো, যে জমার খাজনা বিনা মোকদ্দমায় সহজে আদায় হয়, যে পুকুরে মাছ বাড়ে এবং বেশি দামে নিকিরিদের কাছে বিক্রি হয়, যে আমন ধানের ক্ষেতে জল বাধে সকলের আগে এবং শুকোয় সকলের শেষে—এক কথায় দুধের সরটুকু শরৎ গ্রাস করতে উদ্যত হোল।

আবার আশালতাকে গিয়ে দাঁড়াতে হোল ওর কাছে।

শরৎ চীৎকার করে রেগে তক্তপোষ চাপড়ে কথা বলে, আশা ধীরভাবে মৃদুস্বরে কথা বলে। শরৎ দিন দিন বিস্মিত হচ্ছে, কে জানতো সেই আশা এই মানুষ?

নিধু বিধুকে নিয়ে গিয়ে শরতের সামনে দাঁড় করিয়ে সেদিন বললে—ছেলে দুটো যে একেবারে বয়ে গেল, এরা কবে খাবে কি? এদের উপায় কি করচো বড়দা?

—আমি কি উপায় করবো, তুমি এখন ওদের গার্জ্জেন হয়েচো, তুমি করো—

—আমি তোমার পায়ের জুতোর তলা বড়দা, আমায় অমন কথা বোলো না।

—তোমাকে আর মিষ্টি কথা শোনাতে হবে না আমাকে, যাও এখান থেকে—

—এদের উপায় কি করবে করো বড়দা, পায়ে পড়ি তোমার।

—মাইনে দেবে কে?

—তুমি।

—কেন আমি দেবো? আমার—

শরতের উত্তরের বাকি অংশটুকু ছাপার উপযুক্ত নয়।

আশা চুপ করে থেকে বললে—তোমার পায়ে পড়ি দাদা—এদের লেখা-পড়ার হিল্লে করো—বাঁদর হয়ে গেল একেবারে।

—তবে তো আমার—

শরতের সবটুকু উত্তর ছাপবার পুনরায় অযোগ্য হোল।

আশালতা পরদিন নিজে কোথা থেকে টাকা জোগাড় করে বিধু নিধুকে দুমাইল দূরবর্ত্তী সোনাখালি—বাক্‌সার মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করে দিল। ছেলে দুটো বদ হয়ে গিয়েছিল—নিজে জোর করে ওদের রোজ স্কুলে পাঠিয়ে দিত, নিজে সকাল বিকেলে পড়াতে বসাতো। আশা নিজে লেখাপড়া জানত সামান্যই। গ্রামের অমর্ত্ত গুরুমশায়ের পাঠশালায় বাংলা সরলপাঠ তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু নিজের চেষ্টাতে সে অনেক শিখেছিল। ওর মামার বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে 'এড়েদ'। মা বেঁচে থাকতে সেখানে গিযে দুতিন মাস থাকতো। এঁড়েদ' থেকে একবার মাসীমাব সঙ্গে দক্ষিণেশ্বব গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা শুনেছিল। আমি অন্ততঃ ওর কাছে একখানা কথামৃত দেখেচি। আশা রামায়ণ মহাভারত পড়তো, গীতা দুবেলা পড়তো, বাংলা কবিতা কিছু কিছু পড়তো।

সৎমাকে বলতো—নিধু খুব বুদ্ধিমান মা, ও পড়ালে মানুষ হবে—

মা বলতো—বিধুকে কেমন দেখলি ?

—বুদ্ধি নেই ওর মত। তবে কিছু হবেই।

—তুই চেষ্টা কর, হয়ে যাবে।

আশা যেন উঠে পডে লেগে গেল নিধুকে মানুষ করতে। শয়নে স্বপনে ওর এই এক ভাবনা। নিধুর এতটুকু বেচাল দেখলে নিজে শাসন করে, কড়া পাহারায় পড়াশুনো করায়, একদিন স্কুল কামাই করলে ভাত দেওয়া বন্ধ কবে দেয়।

অথচ আশা আর বিধু নিধুর বয়সের তফাৎ খুব বেশি নয়। আট বছবের কি দশ বছরের।

পাড়ার লোকে বলতো—ওদের মা আর ওদের কি করে—আশা ওদের দিদিকে দিদি, মাকে মা—

শরৎ চেষ্টার ক্রটি করেনি ওদের সম্পত্তি ফাঁকি দেবার। আশা না থাকলে ওরা পথের ফকির হোত একথার কোনো ভুল নেই। শরৎ অত্যন্ত কুচরিত্রের লোক, মদ এবং আনুসঙ্গিক সব কিছুই তার ছিল।

একবার মদ খেয়ে বিধুকে ডেকে বল্লে—বিধু, এই কাগজখানাতে একটা সই দিতে বল মাকে—

বিধু একে বড়দাকে ভয় করে, তার ওপরে মাতাল অবস্থায় বড়দা অধিকতর ভয়ের কারণ, ভালই জানে সে। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সে কাগজখানা মায়ের কাছ থেকে সই করে নিয়ে এসে দিলে।

শরৎ চলে গেল।

এর দিন দশেক পরে আশা নাইতে গিয়ে দেখলে ওদের ঘাটের ধারের বাগানে সাত আটজন লোকের জটলা। পাঁচজন কাঠুরে গাছ কাটছে, দুজন লোক দাঁড়িয়ে লোক খাটাচ্ছে। আশার সঙ্গে ছিল গোয়ালাপাড়ার কালী গোয়ালিনী। সে কালীকে বল্লে—পিসি, গিয়ে জিগ্যেস করো তো ওরা গাছ কাটছে কেন?

কালী জিগ্যেস করে এসে বল্লে—মাঠাকরুণ, ওনারা বললে, শরৎবাবু এ বাগানের গাছ বিক্রি করেছে আমাদের কাছে।

—সে কি কথা! জিগ্যেস ক'রে এসো, কত টাকায় বিক্রি করেচে।

কালী আবার গেল এবং ফিরে এসে বললে—তিনশো টাকায় মা ঠাকরণ—

আশা তখুনি বাড়ি গেল তাড়াতাড়ি স্নান করে। শরতের সঙ্গে কথাটা বলতে শরৎ ধীরভাবে বল্লে—কেন, তোমায় সব জানাতে হবে নাকি? তুমি বাড়ির কে? মার ভাগ মা সই দিয়ে বিক্রি করেছেন, নাবালকদের অছি হয়ে—

—কত টাকা দিয়েছ মাকে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার নেই, জিগ্যেস করে এসো—

—তা ছাড়া ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি করার কি ক্ষমতা আছে

তোমার? পঞ্চাশ ষাট টাকার ফল বিক্রি হয় বছরে। কেন ও বাগানের গাছ কেটে বিক্রি হবে? মা সই দিয়েচে?

—তোমার কাছে আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই, যাও তুমি—

আশা ছুটে এসে সৎমাকে জিগ্যেস করে জানলে কিছুদিন আগে একখানা কাগজে সই দিয়েছিলেন বটে, তবে কি জন্যে তাঁর সই নেওয়া হোলো তা জানেন না তিনি। হ্যাঁ, কাল বিকেলে বিধু এসে তাঁর হাতে তিরিশটি টাকা দিয়ে বলেছিল, বড়দা দিয়েচে। তিনি বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিলেন—এই পর্য্যন্ত।

আশা রেগে বল্লে—তুমি একটি আস্ত বোকা। সই দিতে বল্লে অমনি দিলে। আমাকে জিগ্যেস করনি কেন? তুমি কি জানো কিসের সই?

—তুই তখন বারের পূজো দিতে গিইচিস পঞ্চানন্দ তলায়। শনিবারের দুপুরে। তা ছাড়া শরৎ মদ খেয়ে এসেছিল।

বিধু ভয়ে কেঁদেই বাঁচে না। জানো তো যমের মত ভয় করে ওরা শরৎকে?

—তা তো জানি, এদিকে যে দিব্যি ওদের মাথায় হাত বুলোলো বড়দা। তিনশো টাকায় বাগান বিক্রি করেচে।

তার তিন ভাগের ভাগ একশো টাকা তুমি পাবে—সেই জায়গায় তিরিশটি টাকা ঠেকিয়েচে মোটে—উঃ কি অন্যায় কাজ বড়দার! বোকা বুঝিয়ে দিয়েচে তিরিশ টাকা দিয়ে। তুমি জিগ্যেস করলে না কেন এ টাকা কিসের? আচ্ছা মা, এত বোকা হোলে মানুষ সংসার করতে পারে? বিধু নিধু যখন পথে বসবে তখন মজা টের পাবে কে শুনি? তুমি না আমি?

আশা গিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধালে শরতের সঙ্গে। ফাঁকি দিয়ে গাছগুলো এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া? মায়ের টাকার ভাগই বা দেওয়া হয়েচে কই?

শরৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে—যা—যা, যা পারিস তুই করগে—

আশা রাঙামুখে বল্লে—বড়দা, তুমি এখনো চেনোনি আমায়। বিধু নিধুকে আর ওই বোকা সোকা মাগীকে ফাঁকি দিতে পারো, কিন্তু আমায় পারবে না।

এই চল্লাম বাগানে, দেখি কার সাধ্যি বাগানের গাছ কেটে নিয়ে যায়—আয় তো বিধু আমার সঙ্গে—এখনো এত অরাজক হয় নি দেশে বড়দা—

আশা গিয়ে বাগানে যারা গাছ কাটছিল, বিধুকে দিয়ে তাদের বারণ করে পাঠালে। গাছ বিক্রি করা হয়নি বিধুদের অংশের, বাগানের গাছে কেউ যেন হাত না দেয়।

আশার চেহারার মধ্যে এমন কি একটা জিনিস ছিল, সকলে সমীহ করে চলতো। তারা টাকা দিয়ে দলিল লেখাপড়া করে নিয়েছিলো আগেই—তবুও আশার কথায় গাছ কাটা বন্ধ করলে।

শেষ পর্য্যন্ত শরতের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হোল তারা।

এই সব ব্যাপারে শরৎ ক্রমে আশার মহাশত্রু হয়ে উঠলো। ওর ওপরে নানা নির্য্যাতন সুরু হোল—এমন কি বড ভাই হয়ে বোনের নামে হীন কুৎসা রটাতেও দ্বিধা করলে না।

আশা শরতের কাছে গিয়ে বল্লে—বড়দা, তুমি আমার নামে গাঙ্গুলী কাকাব কাছে এসব কি বলে এসেছো?

শরৎ মন দিয়ে হাঁসের পেনের ডগা কাটছিল। শরতেব স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে চায়েব পেযালা হাতে। শরৎ ওর দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বল্লে—কেন এখানে এসেচিস? বলবো না? তুমি বড্ড সতী—তা আমাব জানতে বাকি নেই—

—কেন কি করেছি আমি?

শরতেব উত্তর ছাপাবার অযোগ্য।

আশা মুখ ফিরিয়ে শরতের স্ত্রীব দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে তো বৌদিদি? বড়দাদার কথা?

শরতের স্ত্রী স্বামীকে অনুযোগের সুরে বল্লে—কি যে বলো, অত বড় সোমত্ত বোনকে ওই সব—

শরৎ দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে—তুমি চা দিয়ে চলে যাও দিকি, নিজের কাজ দেখো গে—

শরতের স্ত্রী চোখের ইসারায় আশাকে চলে যেতে বলে সেখান থেকে সরে গেল। আশা সেকথা শুনলে না, দুজনে দুন্দুমার ঝগড়া বেধে গেল। পাড়ার লোকে উকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। আশাকে অনেক অপমানজনক কটূক্তি শুনতে হোল শবতের মুখে। শেষ পর্যান্ত শরতের স্ত্রী হাত ধরে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। আশার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—ভ্যাখো দিকি বৌদি—কি সব কথা যে উনি বলেন!·· শুনছিলে তো বৌদিদি? আমি নাকি—

—তুমি বাড়ি চলে যাও ঠাকুরঝি, কেন মিথ্যে অপমান হওয়া—আমি কি বলবো বলো? আমার বলবাব যো নেই কিছু সবই জানো। খিডকি দরজা দিয়ে চলে যাও—

কিছুতেই কিন্তু আশাকে দমানো গেল না। সে ডানা দিয়ে আগলে রেখে দিলে বিধু নিধু শৈলকে নয শুধু, তাদের মাকে পর্য্যন্ত, যদিও ওব মা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড। গ্রামের লোকে আশাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকে অনেক বকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কাবো আঁতুড়ে বাত জাগতে হোলে আশা, কোনো যজ্ঞি বাড়িতে রান্না করতে আশা, কাবো বাড়ি থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশে যাবেন, সে বাড়িতে দুচার দিন শুতে হোলে আশা, কারো বাড়ির ডাল বেঁটে দেবার সময়ে আশা। সাবা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মত পাবে। কখনো নিরাশ কবেনি কাউকে।

সেবার বৃদ্ধ বেণী হালদার ওকে বল্লেন—দিদি, একটা উপকার করতে হচ্ছে। রাতে কষ্ট পাচ্চি—একটু দুধ পেলে খেতাম। দুধ পাওয়া যায় না, আমি গরীব, আমায় কেউ দেয়ও না। ছনু বোষ্টমেব গাই দুধ দিচ্ছে, তুমি গিয়ে বলে কয়ে যদি এক্পোয়া করে দুধ দৈনিক যোগান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পাবো—

—দাদু, আপনার ভাত রেঁধে দেয় কে?

—যম। কে দেবে দিদি, এ গাঁয়ে কি কেউ কার দিকে তাকায়? তোমার

দিদি মারা গিয়েচে আজ ছ'বছর, এই ছ' বছরই হাঁড়ি ঠেলচি। ছেলে নেই—মেয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ি। আমি না রাঁধলে রাঁধবে কেডা ?

—আমি যদি রেঁধে দিই, খাবেন দাদু ? যতদিন আপনার বাত না সারে, রেঁধে দিলে খাবেন ?

—খাবো। খেয়ে বর্ত্তে যাবো। দুহাত তুলে নাচবো। মনে করবো ছিক্ষেত্তরের মহাপ্রসাদ খেলাম। কেন, একথা বল্লি কেন দিদি ?

—আমার নামে নানা রকম রটনা রটেচে কিনা গাঁয়ে। বড়দা রটিয়ে বেড়াচ্চে—

—আমার মায়ের নামে যদি রটনা রটতো তবে আমি তাঁর হাতে খেতাম না ?

মাস দুই অর্থাৎ সেবার গোটা শীতকাল ধরে রোজ সকালে এসে বুড়ো বেণী হালদারের রান্না করে দিতো আশা। ফলে সেই শ্রাবণ মাসেই যখন বেণী হালদার মারা গেলেন, তখন নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি থেকে দুবিঘে আমন ধানের জমি তিনি আশার নামে উইল করে দিয়েচেন শোনা গেল। এ নিয়ে মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছিল। বেণী হালদারের জামাই এসে বল্লে ও উইল জাল। সব সম্পত্তি তার ছেলের প্রাপ্য। আশা কে যে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তাঁর শ্বশুর ? শরৎ বেণী হালদারের জামাইয়ের তরফে মোকর্দ্দমার গোপনে তদ্বিরও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশার জমি কেউ কেড়ে নিতে পারে নি।

বিধুর লেখাপড়া যেটুকু হয়েছিল তা আশার চেষ্টা ও উৎসাহের ফলেই। বিধু লেখাপড়ায় খুব ভালো, ম্যাট্রিক পাশ করলে বেশ ভাল ভাবে। ইদানীং শরৎ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হ'য়ে গিয়েছিল, এদের সম্পত্তিতে হাত দিতে সাহস করতো না, আশাকে ভয় করতো। সেই শরতের বৌ যখন হঠাৎ মারা গেল, আশা গিয়ে শরতের সংসারে বুক দিয়ে পড়লো। ওর ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, রান্না করে খাওয়ানো, সব কিছু করতো আশা। অবিশ্যি বেশিদিন করতে হয়নি, কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে শরৎ তিন মাসের বেশি দেরি করেনি।

আশা চোখের জল ফেলে বলেছিল—বৌদিদির যে কি গুণ ছিল, তা কেউ জানতো না, আমি জানতাম। বড়দার ভয়ে জুজু হয়ে থাকতো বেচারি, নিজের ইচ্ছেতে কিছু করবার কি তার উপায় ছিল? অমন বৌকে বড়দা চিনতে পারলে না—দুদিন যেতে তর সইল না, অমনি বিয়ে করে নিয়ে এলো।

মাঘমাসের শেষ। আশা শরতের বাড়ি গিয়ে বল্লে—বড়দা, তোমায় যেতে হচ্চে একবারটি—

—কোথায় যাবো?

—বিধুর বিয়ের জন্তে হাঁটাহাটি করচে সাতবেড়ের দুঃখীরাম চৌধুরী। একবার গিয়ে মেয়ে দেখে এসো—

—আমি যাবো?

—তবে কে যাবে বলো। তুমি আমাদের মাথার মণি, বংশের বড় ছেলে, আমাদের সকলের অভিভাবক। তুমি যা ঠিক করবে ওর বিয়ের বিষয়ে, তাই হবে। যাও গিয়ে দেখে এসো বড়দা—

শরৎ খুসি হয়ে মেয়ে দেখে এসে সব ঠিকঠাক করলে বিয়ের ব্যাপারের। ফাল্গুন মাসেই বিধুর বিয়ে হয়ে গেল। বোশেখ মাসে সরাটি ফুলসরার পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি থেকে নিধুর বিয়ের সম্বন্ধ এল। কেননা নিধু ভালো ছেলে, সেবার আই, এ পরীক্ষা দেবে। আশা আবার গিয়ে শরৎকে ধরলে। শরৎকে বল্লে—বড়দা, বিয়ে তুমি দিও দিও যদি মেয়ে ভালো হয়, কিন্তু নিধুকে যেন তারা আরও পড়ান। পয়সা কড়ি আমাদের দিতে হবে না তাঁকে। মেয়ের বাবাকে এই কথাটা বোলো বড়দা—

নিধুর বিয়ে হয়ে গেল এখানেই। ওরা নিধুকে বি, এ পড়াবার খরচ দিতে লাগলো। যেবার নিধু বি, এ পাশ করে শশুরের যত্নে এম, এ আর আইন আইন পড়তে ভর্ত্তি হোল ইউনিভার্সিটিতে, আশা সেবার খুব অসুখে পড়লো।

ভাদ্রমাসের শেষ। খুব বর্ষা। নিধু কলকাতায়, বিধু মীরপুরের জমিদারী কাছারীতে কাজ করে, সস্ত্রীক সেখানেই থাকে, বাড়িতে কেবল বিধুর মা আর ওদের সকলের ছোট অবিবাহিতা বোন দুলা। আশা ডাক্তার ডাকতে

দেবে না বিধু সামান্য রোজগার করে, ডাক্তারের খরচ পাবে কোথায়? এমনি সেরে যাবে।

রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। তুলা দৌড়ে গিয়ে শরৎকে ডেকে নিয়ে এলো। শরৎ এসে বল্লে—কি হয়েচে মা? আশার নাকি অসুখ?

ওদের মা কেঁদে বল্লে—বাবা শরৎ, তুমি বাঁচাও আমার আশাকে—ও আমার মেয়ে নয়, ও বিধু নিধুদের মা, আমি তো মিথ্যে মা হয়েছিলাম। কি করলাম কার? ওই করেচে সব! সর্ব্বস্ব বিষয় বিক্রি করে দাও, আমার মাকে বাঁচিয়ে তোলো। দুপুর থেকে মা আমাব অজ্ঞান হয়ে আছে, পাঁচ, সাড়ে পাঁচ জ্বর, লোক চিনতে পারচে না, বিছানা হাতড়াচ্চে—

এসব আট দশ বছর আগেকার কথা। বিধু এখন চালের কল আর আড়ত করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচে, নিধু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বারাসাতে পরিবার নিয়ে আছে সম্প্রতি। বড়দিদির কথা বলতে বলতে এখনো ওদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আশার স্মৃতি আমাদের গ্রামের আকাশ বাতাস ছেয়ে আছে। এখনো সকলে বলে—সৎ বোন হলেই কি খারাপ হয়—না সৎমা সৎভাই হোলে খারাপ হয়—আশাকে দেখেচো তো?

শেষ